হিন্দু ধর্মের ইতিবৃত্ত

আকাশ মালিক

হিন্দু ধর্মের ইতিবৃত্ত

আকাশ মালিক

একটি ইস্টিশন ইবুক
www.istishon.com

হিন্দু ধর্মের ইতিবৃত্ত

আকাশ মালিক

ইস্টিশন সংস্করণ: জুলাই, ২০১৭

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক

ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ

কবি

ইবুক তৈরি

নরসুন্দর মানুষ

মূল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।

Hindu Dhormer Itibitto, by Akash Malik

First Edition: July, 2017
Published by: Istishon eBook
Dhaka, Bangladesh.
eBook by: NoroSundor Manush

উৎসর্গ

যারা জীবন দিয়েছেন সত্যের সন্ধানে

সেই সকল মহানদের স্মরণে।

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

উপক্রমণিকা

ইসলাম ধর্মের অনুসারী এক দল জিহাদী যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠা বা খেলাফত কায়েম করার লক্ষ্যে ইসলামের নামে নিরস্ত্র নিরীহ নিরপরাধ মানুষ খুন করে চলেছে আর দুনিয়ার মানুষ এই সন্ত্রাসের শেকড় সন্ধানে তাদের ধর্মগ্রন্থের দিকে মনোনিবেশ করেছে তখনই আরেকটি ধর্মের অনুসারী কিছু লোক প্রচার করতে লাগলেন যে, তাদের ধর্মই সত্য সনাতন শান্তির ধর্ম। যখন যেখানে সন্ত্রাসী মুসলমান মানুষ হত্যা করে তখনই সেখানে আর একদল হিন্দু ঘোষণা দেন 'আমাদের ধর্মে জিহাদ নেই, সাম্প্রদায়ীকতা নেই সন্ত্রাস নেই আমাদের ধর্ম মানবিক এমন কি বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণীত সত্য ধর্ম। অকারণে ঠাকুর ঘর থেকে বারবার যদি চিৎকার শুনা যায় 'আমি কলা খাইনা' তাহলে উঁকি মেরে একবার তো দেখতেই হয় ঠাকুর ঘরের অবস্থাটা কেমন। সুযোগ বুঝে যে সকল হিন্দু নিজ ধর্মের মার্কেটিং করেন তারা দেখে শুনে জেনে বুঝেই মিথ্যাচার করেন। কারণ তাদের চোখের সামনেই ঘটে চলেছে ধর্মের নামে কতোশতো জঘন্য পাশবিক অপকর্ম। ভারতের হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন খোলা মাঠে কোমলমতি শিশু কিশোরদের ধর্মের ইতিহাস শুনায়ে, হাতে তীর বর্শা তলোয়ার তুলে দিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, 'রাম যেভাবে রাবণকে ধ্বংস করেছিলেন আমরাও মুসলমানদের সেই ভাবে ধ্বংস করবো'। মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢেকে রাখার পরিণাম হয় ভয়াবহ ধ্বংসাত্বক। তাই আমরা এই বইয়ে ইতিহাস ও তথ্য প্রমাণের আলোকে হিন্দু ধর্মের স্বরুপ উন্মোচন করবো যেনো নতুন প্রজন্ম আসল সত্যটা জানতে পারে। হিন্দু পরিবারের একটি সন্তানও যদি বইটি পড়ে ধর্মের অসাড়তা বুঝতে পারে, তাহলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি এই সন্তানটি

ধর্মের কারণে কোনোদিন কোনো মানুষকে ঘৃণা করবেনা কোনো নিরপরাধ মানুষ খুন করবেনা।

বইটিকে পাঠযোগ্য করে সাজিয়ে মানুষের কাছে পৌছে দেয়ার জন্যে যে সকল সুহৃদ বন্ধুগণ কষ্ট করেছেন নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন তাদের প্রতি রইলো অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আকাশ মালিক

ইংল্যান্ড, জুলাই ২০১৭।

হিন্দু ধর্মের ইতিবৃত্ত

বিজ্ঞানময় কিতাব, মুসলমানদের পূর্নাঙ্গ জীবনবিধান তাদের ধর্মগ্রন্থ ‘কোরান’, সেই কোরান বোঝার জন্যে হাদিসসমূহ ও হাদিসসমুহের তাফসির পাঠ তো অনেক হলো। এবার সনাতন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বিজ্ঞানময় বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি সংহিতা, গীতা, পুরাণ, আগামশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, ষড়দর্শন, উপনিষদ, ঋগবেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্বেদ, স্থাপত্যর্বেদ ও এই ধর্মের শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক তাদের কিতাবসমুহের তাফসির ব্যাখ্যা পাঠ করার চেষ্টা করবো।

আগে ধর্মটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নেয়া যাক। হিন্দু ধর্ম মূলত আর্যদের বৈদিক ধর্ম। এ ধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থের নাম ঋগবেদ। এ বেদের সূচনাতে একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম ছিল। এটা অবতারবাদের প্রবক্তা। অতঃপর যুগে যুগে ব্রহ্মের অবতারগণ আগমনকরতঃ

ঋগবেদের অনুশীলন করতে গিয়ে এর সাথে স্থান-কাল উপযোগী সংযোজন-সংবর্ধন করে আরো ৪টি সংস্করণ তৈরি করেন। যথা,

১) ঋগবেদ

২) সামবেদ

৩) যজুর্বেদ

৪) অথর্ববেদ

এগুলোই হিন্দু ধর্মের অনুসরণীয় কিতাব। এ গুলোতে বিশ্বাস করাকেই হিন্দু ধর্ম বলে; যাকে পূর্বকালে আর্য ধর্ম বলা হতো।

শুধু বিশ্বাস করলে হবে মানতে হবেনা? বেদে বিশ্বাস না রেখে হিন্দু থাকা যায়? বেদ কি ঈশ্বরের দেয়া অবশ্য পালনীয় বাণী? আধুনিক যুগের কিছু হিন্দু দাবি করছেন, হিন্দু ধর্ম আসলেই মানা মানির কোনো ধর্ম নয়, শাস্ত্রীয় কোনো বিধি বিধান নেই, কিছু মানা বাধ্যতামূলক নয়, মানা না মানা ঐচ্ছিক ব্যাপার, এটি একটি লোকায়ত দর্শন, একটি জাতি একটি দেশের লোকাচার, যাপিত জীবন ও সংস্কৃতির ইতিহাস মাত্র। শুনতে বেশ ভালই লাগলো। কিন্তু আসলেই কি তা'ই?

বেদ থেকে সামান্য উদাহরণ দেয়া যাক;

"হে ঈশ্বর, যারা দোষারোপ করে বেদ ও ঈশ্বরের/তাদের উপর তোমার অভিশাপ বর্ষণ করো"। (ঋগবেদ ২, ২৩, ৫)

"যে লোক ঈশ্বরের আরাধনা করেনা এবং যার মনে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ নেই, তাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে হত্যা করতে হবে"। (ঋগবেদ ১, ৮৪, ৮)

“গবাদিপশুগুলো কী করছে নাস্তিকদের (Kikatas) এলাকায়, যাদের বৈদিক রীতিতে বিশ্বাস নেই, যারা সোমার সাথে দুধ মিলিয়ে উৎসর্গ করেনা এবং গরুর ঘি প্রদান করে যজ্ঞও করেনা? ছিনিয়ে আনো তাদের ধন সম্পদ আমাদের কাছে”।
(ঋগবেদ ৩, ৫৩, ১৪)

Among the Kikatas what do thy cattle? They pour no milky draught, they heat no caldron. Bring thou to us the wealth of Pramaganda; give up to us, O Maghavan, the low-born.
(Kikatas তখনকার ভারতের বিহারএলাকায় বসবাসকারী একদল উপজাতি যারা বেদে বিশ্বাস করতোনা)

“যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ক্ষতি করে, ব্রাহ্মণের গরু নিজের কাজে লাগায় তাকে ধ্বংস করে দাও”। (অথর্ববেদ ১২, ৫, ৫২)

“তাদেরকে হত্যা করো যারা বেদ ও উপাসনার বিপরীত”। (অথর্ববেদ ২০, ৯৩, ১) এবং যজুর্বেদ ৭/৪৪ “তাদের যুদ্ধের মাধ্যমে বশ্যতা মানাতে হবে”।

“সেনাপতি, হিংস্র ও নির্দয়তার সাথে শত্রুদের পরিবারের সদস্যদের সাথেও যুদ্ধ করবে”। (যজুর্বেদ ১৭/৩৯)

“শত্রুদের পরিবারকে হত্যা করো তাদের জমি ধ্বংস করো”। (যজুর্বেদ ১৭/৩৮)
“হাতি, ঘোড়া, অর্থ, শষ্য, গবাদিপশু ও নারী তার দখলে যে যুদ্ধের মাধ্যমে তা জয় করে”। (মনু ৭, ৯৬)

ব্যস এটুকুই যথেষ্ট ছিল হিন্দু ধর্মকে বিবেকহীন চরম অমানবিক ধর্ম হিসেবে জানার জন্যে। কিন্তু এগুলোর চেয়েও নজিরবিহীন মারাত্মক পাশবিক জঘন্য বর্বর রীতিও এই ধর্মের মানুষগুলো পালন করেছে বহুদিন তাদের ভগবান প্রদত্ব বিধান হিসেবে।

‘সতীদাহ প্রথা’। আধুনিক হিন্দুরা নারীকে দোষ দেয়ার লক্ষ্যে এর নাম দিয়েছেন ‘সহমরণ’। তারা বলার চেষ্টা করেন ওগুলো ছিল ‘ইচ্ছেমরণ’। হায়রে বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ!

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কোনো হিন্দু স্বামী মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলে ‘সতী’ বানাতেন। ইংরেজ আমলে আইন করে এ ধর্মীয় বর্বর প্রথাকে রুখতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। কেইনের (Kane) ‘ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস’ (আট খণ্ড) গ্রন্থের ‘সতী’ বিষয়ক কয়েকটি অধ্যায়ে বেশ কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন। এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত মাত্র তিন বছরে নারীর সতীত্ব(?) রক্ষার ধুয়ো তুলে কেবলমাত্র বাংলাতেই (যা তখন বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) ২৩৬৬ জন নারীকে আগুনে পুড়িয়ে সতী বানানো হয়েছিল, যার মধ্যে কলকাতাতেই সতীদাহের সংখ্যা ১৮৪৫। আর ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত বাংলাতে ৮১৩৫ জন নারীকে আগুনে পুড়িয়ে সতী বানিয়েছিলেন ঠাকুর-পুরহিতগণ। এটা কি গণহত্যা নয়? এটা কি জঘন্য-বর্বর ধর্মীয় রীতি নয়?

বীভৎস ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি ইঙ্গিত করে Pascal বলেছেন *Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction.*। হিন্দু নারীরা কি স্বামীর মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় ওঠে সহমরণে যেতেন? মোটেই তা নয়।

ঐতিহাসিকগণ জানিয়েছেন, কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সদ্য বিধবা নারীকে উত্তেজক পানীয় পান করিয়ে কিংবা নেশা জাতীয় দ্রব্য শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে কিংবা অর্ধচেতন অবস্থায় স্বামীর চিতায় তুলে দেওয়া হতো।

এ বিষয়ে ভারতের অন্যতম মানবতাবাদী লেখক ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য তার ‘প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন; “সদ্যবিধবা নারী নববধূর মতো সাজে, তার শ্রেষ্ঠ পোশাক পরে, সিঁদুর, কাজল, ফুলমালা, চন্দন, আলতায় সুসজ্জিত হয়ে ধীরে

ধীরে সে চিতায় ওঠে, তার স্বামীর পা দুটি বুকে আঁকড়ে ধরে কিংবা মৃতদেহকে দুই বাহুতে আলিঙ্গন করে, এইভাবে যতক্ষণ না আগুন জ্বলে সে বিভ্রান্তির সঙ্গে অপেক্ষা করে। যদি শেষ মুহূর্তে বিচলিত হয় এবং নীতিগত, দৃশ্যগতভাবে ছন্দপতন ঘটে তাই শুভাকাঙ্খীরা তাকে উত্তেজক পানীয় পান করান। এমনকি পরে যখন আগুনের লেলিহান শিখা অসহনীয় হয়ে ওঠে, পানীয়র নেশা কেটে যায়, তখন যদি সেই বিধবা বিচলিত হয়ে পড়ে, 'সতী'র মহিমা ক্ষুণ্ন হবার ভয় দেখা দেয়, তখন সেই শুভাকাঙ্খীরাই তাকে বাঁশের লাঠি দিয়ে চেপে ধরে, যদি সে চিতা থেকে নেমে আসতে চায়, প্রতিবেশী, পুরোহিত, সমাজকর্তা সকলেই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য অতিমাত্রায় সাহায্য করতে চায়। তারা গান করে, ঢাক বাজায় এতো উচ্চ জয়ধ্বনি দেয় যে সতী যা কিছু বলতে চায় সবই উচ্চনাদে ঢেকে যায়।" (প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, পৃষ্ঠা ১৪৭)

বর্তমানকালের তথাকথিত 'মডারেট' হিন্দুরা স্বীকার করতে চাইবেন না, অথবা অনেকেই জানেন না তাদের ধর্মগ্রন্থে 'স্বামী মারা গেলে বিধবাকে স্বামীর চিতায় আগুনে পুড়ে মরে সতী হওয়ার' সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। প্রমাণ চাই তো, দেখুন ঋগবেদের দশম মণ্ডলের ১৮নং সূক্তের ৭ নং শ্লোক (১০/১৮/৭) শ্লোকটির ইংরেজি হচ্ছে:

Let these women, whose husbands are worthy and are living, enter the house with ghee (applied) as collyrium (to their eyes). Let these wives first step into the pyre, tearless without any affliction and well adorned.

অথর্ববেদে রয়েছে, "আমরা মৃতের বধু হবার জন্য জীবিত নারীকে নীত হতে দেখেছি।" (১৮/৩/১,৩)। পরাশর সংহিতায় পাই, "মানুষের শরীরে সাড়ে তিন কোটি লোম থাকে, যে নারী মৃত্যুতেও তার স্বামীকে অনুগমন করে, সে স্বামীর সঙ্গে ৩৩ বৎসরই স্বর্গবাস করে।" (৪:২৮)।

দক্ষ সংহিতার ৪:১৮-১৯নং শ্লোকে বলা হয়েছে, "A sati who dies on the funeral pyre of her husband enjoys an eternal bliss in heaven." (যে সতী নারী স্বামীর মৃত্যুর পর অগ্নিতে প্রবেশ করে সে স্বর্গে পূজা পায়)। এই দক্ষ সংহিতার পরবর্তী শ্লোকে (৫:১৬০) বলা হয়েছে, "যে নারী স্বামীর চিতায় আত্মোৎসর্গ করে সে তার পিতৃকুল, স্বামীকুল উভয়কেই পবিত্র করে।" যেমন করে সাপুড়ে সাপকে তার গর্ত থেকে টেনে বার করে তেমনভাবে সতী তার স্বামীকে নরক থেকে আকর্ষণ করে এবং সুখে থাকে। ব্রহ্মপুরাণ বলে, "যদি স্বামীর প্রবাসে মৃত্যু হয়ে থাকে তবে স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর পাদুকা বুকে ধরে অগ্নিপ্রবেশ করা।" (প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, পৃষ্ঠা ১৪০)।

মহাভারতের মৌষল পর্বে আমরা দেখতে পাই, মহাত্মা বসুদেবের মৃত্যুর পর তাঁর চার স্ত্রী দেবকী, রোহিণী, ভদ্রা এবং মদিরা তাঁর চিতায় সহমৃতা হয়েছিলেন।
'প্রাতঃকালে প্রবলপ্রতাপ মহাত্মা বসুদেব যোগাবলম্বন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিলেন। তখন তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে ঘোরতর ক্রন্দনশব্দ সমুত্থিত হইয়া সমুদায় পুরী প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। কামিনীগণ মাল্য ও আভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলোলয়িতকেশে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সেই বসুদেবের মৃতদেহ বহুমূল্য নরযানে আরোপিত করিয়া অন্তঃপুর

হইতে বহির্গত হইলেন। দ্বারকাবাসিগণ দুঃখশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ভৃত্যগণ শ্বেতচ্ছত্র ও যাজকগণ প্রদীপ্ত পাবক লইয়া সেই শিবিকাযানের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা, বসুদেবের পত্নীচতুষ্টয় তাঁহার সহমৃতা হইবার মানসে দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত ও অসংখ্য কামিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ঐ সময় জীবদ্দশায় যে স্থান বসুদেবের মনোরম ছিল, বান্ধবগণ সেই স্থানে তাঁহাকে উপনীত করিয়া তাঁহার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার দেবকী প্রভৃতি পত্নীচতুষ্টয় তাঁহাকে প্রজ্বলিত চিতাতে আরোপিত দেখিয়া তদপুরি সমারূঢ় হইলেন'।

'When morning dawned, Vasudeva of great energy and prowess attained, through the aid of Yoga, to the highest goal. A loud and heart-rending sound of wailing was heard in Vasudeva's mansion, uttered by the weeping ladies. They were seen with dishevelled hair and divested of ornaments and floral wreaths. Beating their breasts with their hands, they indulged in heart-rending lamentations. Those foremost of women, Devaki and Bhadra and Rohini and Madira threw themselves on the bodies of their lord. Then Partha caused the body of his uncle to be carried out on a costly vehicle borne on the shoulders of men. It was followed by all the citizens of Dwaraka and the people of the provinces, all of whom, deeply afflicted by grief, had been well-affected towards the deceased hero. Before that vehicle were borne the umbrella which had been held over his head at the conclusion of the horse-sacrifice he had achieved while living, and also the blazing fires he had daily worshipped, with the priests that had used to attend to them. The body of the hero was followed by his wives decked in ornaments and surrounded by thousands of women and thousands of their daughters-in-law. The last rites were then performed at that spot which had been agreeable to him while he was alive. The four

wives of that heroic son of Sura ascended the funeral pyre and were consumed with the body of their lord. All of them attained to those regions of felicity which were his. The son of Pandu burnt the body of his uncle together with those four wives of his, using diverse kinds of scents and perfumed wood. As the funeral pyre blazed up, a loud sound was heard of the burning wood and other combustible materials, along with the clear chant of Samans and the wailing of the citizens and others who witnessed the rite. After it was all over, the boys of the Vrishni and Andhaka races, headed by Vajra, as also the ladies, offered oblations of water to the high-souled hero'. (The Mahabharata, Book 16, Mausala porva, Section 7)

এখানে কৃষ্ণের স্ত্রীদের নিয়ে কিছু কথা বলতে হয় কারণ অনেকে তাঁর স্ত্রী রোহিণী নিয়ে বিভ্রান্ত হতে পারেন। উইকিসহ বিভিন্ন লেখকদের লেখায় রোহিণীকে শ্রী কৃষ্ণের স্ত্রী হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। হ্যাঁ বসুদেবের দ্বিতীয় স্ত্রীর নামও রোহিণী ছিল। কৃষ্ণের মোট ১৬১০৮ জন স্ত্রীর মধ্যে একজনের নাম রোহিণী থাকতেই পারে। ১৬১০৮ জনের মধ্যে আটজন ছিলেন তাঁর প্রধান স্ত্রী। প্রধানরা হলেন; সত্যভামা, জাম্ববতী, নগ্নাজিতি, কালিন্দি, মদ্রা, মিত্রবিন্দা, ভদ্রা ও রোহিণী। প্রথম স্ত্রী রুক্ষিণীকে নিয়ে এরা হলেন নয়জন। অনেকে রোহিনীকে জাম্ববতীর অন্য নাম হিসেবে ধরে থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণের ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়েও শ্রী কৃষ্ণের ৮ স্ত্রীর নামের সাথে রোহিণীর নাম উল্লেখ আছে যেমন; (১) কালিন্দী (২) মিত্রবিন্দা (৩) নগ্নজিৎকন্যা সত্যা (৪) জাম্ববতী (৫) রোহিণী (৬) মদ্ররাজসুতা সুশীলা (৭) সত্রাজিতকন্যা সত্যভামা (৮) লক্ষ্মণা। (দ্রষ্টব্যঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচরিত্র -তৃতীয় খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ)

যদিও বঙ্কিমচন্দ্র পুরাণের এই বর্ণনাকে আষাঢ়ে গল্প আখ্যা দিয়েছেন তবু কথা থেকে যায় যে, শুধুমাত্র কৃষ্ণের এই ১৬১০৮ জন স্ত্রীর কাহিনি কেন আষাড়ে গল্প হবে, সম্পূর্ণ বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত কেন হবেনা? শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত একজন

শ্রেষ্ট গল্পাকারের অনুসন্ধানী চোখে তা ধরা পড়লোনা কীভাবে তা এক বিষ্ময়ই বটে। এই দেড় হাজারের অধিক বিয়ের পেছনের যুক্তিগুলোও তো ফুক দিয়ে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিতাবে লিখিত হয়েছে; *‘কৃষ্ণ বিদর্ভ রাজ্যের রাজকন্যা রুক্মিণীকে তাঁর অনুরোধে শিশুপালের সাথে অনুষ্ঠেয় বিবাহ মণ্ডপ থেকে হরণ করে নিয়ে এসে বিবাহ করেন। এরপরই কৃষ্ণ ১৬১০০ নারীকে নরকাসুর নামক অসুরের কারাগার থেকে উদ্ধার করে তাদের সম্মান রক্ষার্থে তাদের বিবাহ করেন। কৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করে সমস্ত বন্দী নারীদের মুক্ত করেন। তৎকালীন সামাজিক রীতি অনুসারে বন্দী নারীদের সমাজে কোন সম্মান ছিল না এবং তাদের বিবাহের কোন উপায় ছিল না কারণ তারা ইতিপূর্বে নরকাসুরের অধীনে ছিল। বৈষ্ণব মতে কৃষ্ণের সমস্ত মহিষীগণই ছিলেন দেবী লক্ষ্মীর অবতার অথবা সেই সব নারী যারা বহু জন্মের তপস্যাবলে কৃষ্ণের স্ত্রী হওয়ার অধিকার লাভ করেছিলেন*। (সূত্রঃ Charudeva Shastri, Suniti Kumar Chatterji (1974) David L. Haberman, (2003) Motilal Banarsidass, ‘The Bhaktirasamrtasindhu of Rupa Gosvamin’ p. 155, এবং ‘সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস তীর্থে গমন’ মুষল পর্ব, মহাভারত - কাশীরাম দাস।)

শ্রী কৃষ্ণের কয়েকটি বিয়ের নমুনা দেখা যাক। রুক্মিণী ছিলেন শিশুপালের বাগদত্তা। যুধিষ্ঠির যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি সমস্ত মহান রাজাদের সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান। যখন তিনি তাঁদের প্রত্যেককে একে একে সম্মান জ্ঞাপন করতে আরম্ভ করলেন তখন তিনি সর্বপ্রথম কৃষ্ণকে সম্মান জ্ঞাপন করলেন কারণ তিনি কৃষ্ণকেই সমস্ত রাজাদের মধ্যে মহান হিসেবে গণ্য করেছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল রাজারাই তাতে সম্মত হলেও কৃষ্ণের আত্মীয় শিশুপাল তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কৃষ্ণের নিন্দা শুরু করেন। কৃষ্ণ শিশুপালের মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি শিশুপালের একশত অপরাধ ক্ষমা করবেন। তাই যখন শিশুপাল একশত অপরাধ অতিক্রম করলেন তখন তিনি তার বিরাট রূপ ধারণ করে সুদর্শন চক্রের দ্বারা শিশুপালকে বধ করলেন। তারপর, কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বিয়ের আসর থেকে

জোর করে উঠিয়ে নিয়ে বিয়ে করেন। সত্যভামার বাবা সত্রাজিতের কাছে একটি অমূল্য মণিরত্ন দেখে কৃষ্ণ প্রলুব্ধ হন। মণিটি দখল করার জন্য সত্রাজিতকে হত্যা করে কৃষ্ণ তার মেয়ে সত্যভামাকে বিয়ে করেন। সত্রাজিতকে হত্যা করার পরে যখন জানলেন মণিটি জাম্ববান নামে এক আদিবাসী রাজার কাছে আছে তখন কৃষ্ণ তাকে মেরে মণিটি দখল করেন এবং তার মেয়ে জাম্ববতীকে বিয়ে করেন। আরেকটি কাহিনিতে জানা যায়, বিয়ের আগে সত্যভামার সঙ্গে প্রেম ছিল এক তরুণের। সত্যভামাকে পছন্দ হওয়ায় কৃষ্ণ সেই তরুণকে মেরে ফেলেন। কৃষ্ণ আটটি ষাঁড় মেরে এক রাজার মেয়ে নগ্নাজিতিকে বিয়ে করেন । কালিন্দি নামের অল্প বয়েসী মেয়েকে যমুনা নদীর পাড়ে ঘুরতে দেখে কৃষ্ণ মোহিত হন। তাঁকে অর্জুনের সহায়তায় বিয়ে করেন। মিত্রবিন্দা ছিলেন কৃষ্ণের খালাতো বোন। তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল দুর্যোধনের সঙ্গে। বিয়েতে সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হলেও কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। তখন কৃষ্ণ জোর করে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে বিয়ে করেন। ভদ্রাকে স্বয়ম্বর সভায় অংশ নিয়ে কৃষ্ণ বিয়ে করেন। আর রোহিনীকে বিয়ে করেন এক আদিবাসী রাজাকে হত্যা করে। কৃষ্ণ ভক্তগণ ১৬১০৮ নারীকে বিয়ে করা কৃষ্ণের অপরিসীম শক্তি ও তিনি যে ভগবান ছিলেন তার প্রমাণ হিসেবেই দেখেন। স্বগর্বে তারা লিখেন- 'Lord Krishna managed to live peacefully with 16,000 wives'। সুত্রঃ http://www.speakingtree.in/allslides/lord-krishna-managed-to-live-peacefully-with-16-000-wives

শোনা যায় এক রাতে তেরোজন স্ত্রীগমনকারী ইসলামের নবি মুহাম্মদের শরীরে তিরিশ জন পুরুষের শক্তি ছিল, ষোল হাজার নারীগমনকারী হিন্দুদের ভগবান কৃষ্ণের দেহে কতোজন পুরুষের শক্তি ছিল তা স্বয়ং ভগবানই বোধ হয় জানেন না।

যাক ফিরে আসি 'সতীদাহ প্রথা'য়। ব্যাসস্মৃতি বলছে, চিতায় বিধবা নারী তার স্বামীর মৃতদেহে আলিঙ্গন করবেন অথবা তার মস্তকমুণ্ডন করবেন। (২:৫৫)। ষষ্ঠশতকের বরাহমিহির তার বৃহৎসংহিতায় বলেন, "অহো নারীর প্রেম কি সুদৃঢ়, তারা স্বামীর দেহ

ক্রোড়ে নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করে।” (৭৪:২৩)। এ কুযুক্তি শুধু বরাহমিহির কেন, আজকের একুশ শতকের কতিপয় পুরোহিত-ঠাকুর গর্বভরে ঘোষণা করেন, “নারী তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসার জন্যই সহমরণে যায়; এ হিন্দু নারীর বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য, মমত্ব, স্বামীর প্রতি অগাধ ভালোবাসার দুর্লভ উদাহরণ।” ঠাকুর-পুরহিতের প্রচলিত ভণ্ডামিপূর্ণ বক্তব্যের স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য; তিনি বলেন: “বৃহৎসংহিতার যুগ থেকেই সমাজ এই অতিকথা ঘোষণা করে আসছে যে নারী তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসার জন্যই সহমরণে যায়। এই মিথ্যার অবসান হওয়া উচিৎ। যদি স্বামীর প্রতি প্রেমে এক নারী আত্মহত্যা করে তবে কেন আজ পর্যন্ত কোনো স্বামী তার স্ত্রীর চিতায় আত্মহত্যা করেনি? এ তো হতে পারে না যে আজ পর্যন্ত কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসেনি। যদি সতীদাহের ভিত্তি হতো প্রেম, তবে আমরা অবশ্যই কিছু কিছু ঘটনা দেখতে পেতাম যেখানে মৃত স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীও সহমরণে গেছেন। কিন্তু তা হয়নি, এ বিষয়ে কোনো শাস্ত্রীয় বিধিও নেই। সুতরাং মূল ব্যাপার হল স্বামীর স্বার্থে স্ত্রীর সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন; আর সতীদাহ এই আজীবন নাটকেরই পঞ্চমাংকের শেষ দৃশ্য।” (দ্রষ্টব্য: প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, পৃষ্ঠা ১৪৮)

রামায়ণেও আমরা দেখি, রাবণের কাছে বন্দি থাকাকালে সীতার “সতীত্ব” ঠিক ছিল কি-না সেটা জানার জন্য অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। সেটা ভগবান রামও অনুমোদন করে দেন! অথচ, রামের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো অধিকার কারও ছিল না! একই ঘটনা ঘটেছে বেহুলার বেলায়, দ্রোপদীর বেলায়ও। জগতে এই ধর্মটাই নারীকে সব চেয়ে বেশী অসম্মান অপমান, অবদমন পদদলিত করেছে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের আগে থেকেই ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। প্রাচীন সতীদাহ প্রথার উদাহারণ পাওয়া যায় অন্তর্লিখিত স্মারক পাথরগুলিতে। এ পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীন স্মারক পাথর পাওয়া যায় মধ্যপ্রদেশে, কিন্তু সব থেকে বড়ো আকারের সংগ্রহ পাওয়া যায় রাজস্থানে। এই স্মারক পাথরগুলিকে সতীস্মারক পাথর বলা হতো যেগুলি পুজো করার বস্তু ছিল [*Shakuntala Rao Shastri, Women in the Sacred Laws –*

The later law books (1960)]। ডাইয়োডরাস সিকুলাস (*Diodorus Siculus)* নামক গ্রিক ঐতিহাসিকের খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের পাঞ্জাব বিষয়ক লেখায়ও সতীদাহ প্রথার বিবরণ পাওয়া যায় [*Doniger, Wendy (2009). The Hindus: An Alternative History. Penguin Books. p. 611]*।

ধর্মের আফিমীয় মাদক মানুষকে কতটুকু নিবোর্ধ-মানবিকতাশূণ্য বানিয়ে দেয়, তারই উদাহরণ হতে পারে উপমহাদেশের এই সতীদাহ প্রথা। ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানের কারণে ‘ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ সরকার প্রথমদিকে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী ছিল না। কিন্তু ইংল্যান্ডে উদারপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা এবং উনিশ শতকের বিশের দশকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভিত মজবুত হওয়ার পর সরকার কিছু জনহিতকর আইন প্রণয়নের চিন্তাভাবনা শুরু করে। খ্রিস্টান মিশনারি, ঈঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র এবং রাজা রামমোহন রায়সহ কতিপয় দেশীয় সংস্কারবাদী জনহিতকর সংস্কারের পক্ষে সমর্থন যোগান। অবশেষে নিজ দেশের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক (১৮২৮-১৮৩৩) রেগুলেশন XVII, ১৮২৯ পাস করেন। বেন্টিঙ্ক নিজেও একজন মানবহিতৈষী সংস্কারপন্থী ছিলেন। এই আইনে ‘সতীদাহ প্রথা বা হিন্দু বিধবা নারীকে জীবন্ত দাহ বা সমাধিস্থ করা বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ধর্মগ্রন্থ দিয়ে বা ‘বেদে সতীদাহ নেই’ প্রচার করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেছিলেন তা আদৌ বাস্তবসম্মত নয়। এর পূর্বে মুসলমান মোঘল শাসকেরা বারবার চেষ্টা করেছেন তা বিলুপ্ত করার জন্যে। ইংরেজ গভর্নর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ছিলেন এই অমানবিক প্রথা বিলুপ্তির আসল কারিগর। কিন্তু এরপরেও নারীকে জীবন্ত পোড়ানো হয়েছে ধর্মের নামেই।

হিন্দু ধর্মের বেদ-গীতা, মনুসংহিতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণপাচালি ইত্যাদির মধ্যে এতো জাতপাতের বৈষম্য, বর্ণভেদ, গোত্রবিভেদ, ধর্মভেদ, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা, নারীর প্রতি কুসংস্কার, বিরূপ ধারণা, ভয়, ঘৃণা,

জংলী আইন-কানুন একই ধর্মাবলম্বী বলে ঘোষণা করেও শূদ্র-বৈশ্যর প্রতি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের শ্রেণীবিভেদের বিপুল সমাহার আর সরব উপস্থিতি ও চর্চা দেখেই হয়তো উপনিবেশিক ভারতবর্ষে বাংলার রেনেসাঁসের অন্যতম প্রাণপুরুষ বলে পরিচিত হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) ও তাঁর অনুসারীরা Athenium নামক মাসিক পত্রিকায় সোচ্চারে ঘোষণা দিয়েছিলেন, ‘If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism’.

“হিন্দু বিজ্ঞানী ভাস্করাচার্য (১১১৪-১১৮৫) বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের (১৬৪২-১৭২৭) জন্মেরও কমপক্ষে পাঁচশত বছর পূর্বে মহাকর্ষ শক্তি আবিষ্কার করে তাঁর গ্রন্থ ‘সিদ্ধান্ত শিরোমণি’তে আলোচনা করেছেন; ‘আধুনিক বিশ্বে সকলের ধারণা মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ শক্তি নিউটন প্রথম আবিষ্কার করেছেন। অনেকেই জানেন না যে, এ বিষয়ে হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদে স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ‘সবিতা যন্ত্রৈঃ "পৃথিবী মরভণাদস্কম্ভনে সবিতা দ্যামদৃংহৎ অশ্বমিবাধুক্ষদ্ধু নিমন্তরিক্ষমতূর্তে বদ্ধং সবিতা সমুদ্রম’। - ঋগবেদ, ১০/১৪৯/১।

অনুবাদ: সূর্য রজ্জুবৎ আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে,নিরাধার আকাশে দ্যুলোকের অন্যান্য গ্রহকেও ইহা সুদৃঢ় রাখিয়াছে, অচ্ছেদ্য আকর্ষণ রর্জ্জুতে আবদ্ধ, গর্জনশীল গ্রহসমূহ নিরাধার আকাশে অশ্বের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে।’ দেখুন, আকাশ যে ‘নিরাধার’ এবং ‘রজ্জুবৎ আকর্ষণ’ অর্থাৎ মহাকর্ষ শক্তির দ্বারাই যে সেই নিরাধার আকাশে সূর্য ও গ্রহসমূহ নিজ অক্ষরেখায় সুদৃঢ় রয়েছে, এখানে সেকথা বলা হয়েছে। বিশ্বের প্রভাবশালী অনেক ধর্মগ্রন্থে আকাশকে স্পষ্টভাবে ‘পৃথিবীর ছাদ’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে অথচ এই সব ধর্মমতের জন্মেরও হাজার বছর পূর্বে বেদে আর্য ঋষিগণ আকাশকে ‘নিরাধার’ অর্থাৎ পৃথিবীকে ও গ্রহসমূহকে শূন্যে ভাসমান বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। আরও লক্ষণীয়, মহাকর্ষ শক্তিতে আবদ্ধ গ্রহসমূহ যে নিরাধারে অর্থাৎ মহাশূন্যে স্থির নয়, বরং পরিভ্রমণ করছে নিজ কক্ষপথে -এই তত্ত্বও

আবিষ্কার করেছিলেন বৈদিক ঋষিগণ, এমনকি সূর্য নিজেও যে তার নিজস্ব কক্ষপথে চলছে সেই অত্যাশ্চর্য গূঢ় বিজ্ঞানও আলোচিত হয়েছে নিম্নের মন্ত্রে:-

"আকৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্তঞ্চ হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন ঋগবেদ, ১/৩৫/২ অনুবাদ: "সূর্য আকর্ষণযুক্ত পৃথিব্যাদি লোক-লোকান্তরকে সঙ্গে রাখিয়া নশ্বর-অবিনশ্বর উভয় পদার্থকে নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত রাখিয়া এবং মাধ্যাকর্ষণ রূপে রথে চড়িয়া যেন সারা লোকান্তর দেখিতে দেখিতে গমন করিতেছে।" খুব অবাক হতে হয়, পৃথিবী যেমন চাঁদকে সঙ্গে নিয়ে সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করছে, তদ্রুপ সূর্যও যে তার গ্রহ-উপগ্রহসমূহকে সঙ্গে নিয়ে নিজের কক্ষপথে গমন করছে -এই গভীর জ্ঞানও পবিত্র বেদে আলোচিত হয়েছে'। (সংগৃহিত)

এতোক্ষণ একজন বেদে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীর বক্তব্য আমরা শুনছিলাম। অনেক হিন্দু ভাইকে বলতে শুনি যে, হিন্দু ধর্ম সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অন্য ধর্মকে কটাক্ষ

করেনা। কিন্তু এখানে স্পষ্টই দেখা যায় মুসলমানদের কোরানকে একটা খোঁচা দিয়ে নিজের ধর্মের তা'রিফ করা হলো। একদিন আমরা দু'জন বন্ধু সৌরজগতের উপর প্রফেসর ব্রায়েন কক্স এর একটি টিভি সিরিজ দেখছিলাম, আর পাশে বসা ছিল ধর্মবাদী আমাদের আরেকজন বন্ধু। বারবারই বড় ডিস্টার্ব করছিল এই বলে যে, এ আর নতুন কী, এ সবই তো আমাদের কোরানে ১৪শো বছর আগে থেকেই লেখা আছে। আমি বিরক্ত হয়ে একবার জিজ্ঞেস করলাম-

- পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে এ কথা কোরানে লেখা আছে?
- নিশ্চয়ই আছে।
- কোন সুরায় কতো নং আয়াতে?
- খুঁজে দেখো নিশ্চয়ই পাবে।
- তুমি জানো আছে?
- অবশ্যই জানি।
- কোথায় কোন্ জায়গায় কোন্ পৃষ্টায় খুঁজবো?
- সমস্ত কোরান খুঁজে দেখো নিশ্চয়ই আছে।
- তুমি যখন জানো বলে দেওনা, অন্তত সুরাটার নাম।
- আমি যেহেতু জানি আছে আমার খোঁজার দরকার নাই, তুমি যেহেতু জানোনা তুমি খুঁজে দেখো, আর না পাওয়া পর্যন্ত খুঁজতে থাকো।

আমার মনে হয় সকল ধর্মেই এমন কিছু বুদ্ধিমান মানুষ আছেন। এবার একজন অবিশ্বাসী বিজ্ঞানীর কিছু বক্তব্য শোনা যাক। বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহা একবার মাসিক ভারতবর্ষ পত্রিকায়, 'একটি নতুন জীবন দর্শন' (১৩ নভেম্বর, ১৯৩৮) শিরোনামের একটি প্রবন্ধে, কটাক্ষমূলক একটি উক্তি করেছিলেন। উক্তিটি হলো 'সবই ব্যাদে আছে' এই উক্তিটি নিয়ে অনিলবরণ রায় নামের এক হিন্দুত্ববাদী ব্যাপক জলঘোলা করা শুরু করলে, এর ব্যাখ্যায় মেঘনাদ সাহা বলেন -

"... প্রায় আঠারো বৎসর পূর্বেকার কথা। আমি তখন প্রথম বিলাত হইতে ফিরিয়াছি। বৈজ্ঞানিক জগতে তখন আমার সামান্য কিছু সুনাম হইয়াছে। ঢাকা শহরবাসী এক উকিল আমি কি বৈজ্ঞানিক কাজ করিয়াছি তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি উৎসাহভরে তাহাকে আমার প্রথম জীবনের তদানীন্তন গবেষণা সম্বন্ধে সবিশেষ বর্ণনা দেই। তিনি দু-এক মিনিট পরপরই বলিয়া উঠিতে লাগিলেন, "এ আর নতুন কি হইল, এ সমস্তই ব্যাদ-এ আছে"। আমি দু একবার মৃদু আপত্তি করিবার পর বলিলাম,' মহাশয় এ সব তত্ত্ব বেদের কোন অংশে আছে তাহা অনুগ্রহ পূর্বক দেখাইয়া দিবেন কি?' তিনি বলিলেন 'আমি তো ব্যাদ পড়ি নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমরা নূতন বিজ্ঞানে যাহা করিয়াছ বলিয়া দাবি কর, তাহা সমস্তই 'ব্যাদে' আছে'। বলা বাহুল্য যে, বিগত কুড়ি বৎসর ধরিয়া বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে। অনেকে মনে করেন,ভাস্করাচর্য একাদশ শতাব্দীতে অতি স্পষ্টভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,সুতরাং তিনি নিউটনের সমতুল্য। অর্থাৎ নিউটন আর নতুন কি করিয়াছে? কিন্তু এই সমস্ত 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' শ্রেণীর তার্কিকগন ভুলিয়া যান যে, ভাস্করাচর্য কোথাও পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চারিদিকে বৃত্তাভাস(elliptical) পথে ভ্রমণ করিতেছে একথা বলেন নাই। তিনি কোথাও প্রমাণ করেন নাই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও গতিবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগ করিলে পৃথিবীর এবং অপরাপর গ্রহের পরিভ্রমণপথ নিরূপণ করা যায়। সুতরাং ভাস্করাচার্য বা কোন হিন্দু, গ্রীক বা আরবী পণ্ডিত কেপলার, গ্যালিলিও বা নিউটনের বহু পূর্বেই মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিস্কার করিয়াছেন, এইরূপ উক্তি করা পাগলের প্রলাপ বই কিছু নয়"।

পশ্চিমে প্রতি ক্রিসমাসে মরিয়ম পুত্র যিশুর জন্ম নিয়ে বাঁকা কথা জৌক কৌতুক প্রায়ই শোনা যায়। কারণ বিজ্ঞানের যুগে অনেকেই পিতাহীন সন্তান মানতে রাজী নয়। তবে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে মাতার কর্ণপথে প্রসবিত সন্তান মহাবীর কর্ণ আর মানবমস্তকবিহীন

প্রভু গণেশের জন্মদিনে এমন অশুভ কথা একেবারেই কারো মুখে শোনা যায়না। সম্ভবত এর কারণ কর্ণের জন্ম হয়েছিল টেস্টটিউবের মাধ্যমে, আর গণেশের হস্তিমস্তক 'জেনেটিক ক্লোনিং' বা প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে। হয়তো এভাবেই ইঙ্গিত দেয়া আছে পবিত্র গ্রন্থ বেদ ও মহাভারতে।

অন্যরা না মানলেও সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তো মানতেই হয়, ধর্মগ্রন্থ বলে কথা। বিশেষ করে তা যদি হয় রাষ্ট্রের প্রধানব্যক্তির সমর্থনপ্রাপ্ত। ২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মুম্বাইয়ের এক হাসপাতালে প্রচুর বিদ্বান ডাক্তার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিত সমাবেশে ঘোষণা দেন-

"We can feel proud of what our country achieved in medical science at one point of time. We all read about Karna in the Mahabharata. If we think a little more, we realise that the Mahabharata says Karna was not born from his mother's womb. This means that genetic science was present at that time. That is why Karna could be born outside his mother's womb."

প্রধানমন্ত্রী গর্বিত কণ্ঠে আরও বলেন-

"We worship Lord Ganesha. There must have been some plastic surgeon at that time who got an elephant's head on the body of a human being and began the practice of plastic surgery." (গার্ডিয়ান, ২৮ অক্টোবর ২০১৪।)

নরেন্দ্র মোদী মনে করেন মহাভারতের বর্ণনানুযায়ী কর্ণের জন্ম হয়েছিল তার মায়ের জরায়ুর বাইরে। তাই কর্ণ নির্ঘাত 'টেস্ট টিউব বেবি' কিংবা হয়তো 'জেনেটিক ক্লোনিং' এর ফল। মোদী বলেছেন, প্রাচীন ভারতের ঋষিরা 'জেনেটিক সায়েন্স' জানতেন। তিনি

আরো বলেন, বিজ্ঞানের যে নব নব আবিষ্কারের জন্য আমরা গর্ববোধ করি, তার সবই প্রাচীন ভারতের জ্ঞানের চর্বিতচর্বন।

এবার দেখা যাক আসল ঘটনাটা কী? কর্ণ ছিলেন পঞ্চপাণ্ডবজননী কুন্তীর প্রথম পুত্র। তার আদি নাম ছিল বসুষেণ। কর্ণের জন্ম হয়েছিল তার মায়ের বিয়ের আগে। রূপেলাবণ্যে কুন্তী ছিলেন অতীব সুন্দরী। বিয়ের আগে কুমারীকালে একদিন মুনি দুর্বাসা অতিথি হিসেবে কুন্তীর ঘরে এসেছিলেন। সুন্দরী কুমারী কুন্তী মুনি দুর্বাসার সেবা-যত্নে মনযোগী হলেন আর ঋষি মন দিলেন কুন্তীর কল্যাণে। সেবা-যত্নে মুগ্ধ ঋষি দুর্বাসা খুশি হয়ে কুন্তিকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দেন। এই মন্ত্র পড়লে কুন্তী যে দেবতাকে ডাকবেন, সে দেবতাই কুন্তীর ডাকে স্বর্গ থেকে বিলম্ব না করে ধরাতলে নেমে আসবেন। আর ওই দেবতার ঔরসে কুন্তী এক সুপুত্র লাভ করবেন। এখানে পাঠকগণকে বিভ্রান্তমুক্ত রাখতে আগেই জানিয়ে রাখি, যারা ঈসা নবির মাতা মরিয়ম বিবির কাহিনি আর ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিবির ঘরে পালিত মুসা নবির কাহিনি পুরোপুরি জানেন তারা ঘটনার প্রায় হুবহু মিল দেখে মনে করতে পারেন এমন কপি-পেস্ট হলো কীভাবে?

না, কর্ণের জন্মে কিছুটা অমিলও আছে। সেটাই এবার বলি। সবেমাত্র কৈশোরোত্তীর্ণ কৌতুহলী কুন্তী একদিন বাড়ির কোণে গিয়ে ঋষির দেয়া বরের কেরামতি পরীক্ষা

করতে মন্ত্র পড়ে সূর্যকে আহবান করে বসলেন। এমন ভক্তের আহবানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে কোনো অন্ধ দেবতা আছে নাকি এই জগতে? মুহূর্ত দেরী না করে সূর্যদেব সহাস্য বদনে কুন্তীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। কুন্তী এহেন আচম্বিত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ভয় পেয়ে গেলেন। ভয়ে অস্থির কুন্তী মিনতি করেন 'আমি কুমারী আমার বিবাহ হয়নি আমি আমার পেটে কারো সন্তান নিতে পারবেন না'। দেবতাও নাছোড় বান্দা। মন্ত্রের টানে তিনি এতোদূর এসেছেন এখন সকল কাম না সেরে ফিরে গেলে তিনি আর কীসের দেবতা! সুতরাং কাম সারতেই হলো কুন্তীর সাথে দেবতার সঙ্গম হলো। তবে সঙ্গমের আগে দেবতা বলেছিলেন কুন্তী পুত্র সন্তান জন্ম দেয়ার পরও কুমারীই থাকবেন। কীভাবে সম্ভব হলো? কুন্তীর জরায়ুপথে কর্ণের জন্ম না হয়ে জন্ম হল কুন্তীর কর্ণ দিয়ে। আর এ জন্যেই পুত্রের নাম রাখা হয় কর্ণ।

(সূত্রঃ 'সনাতন ভাবনা ও সংস্কৃতি'

http://sonatonvabona.blogspot.co.uk/2013/12/blog-post_14.html

এবং 'সবই ব্যাদে আছে' অভিজিৎ রায়,

http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/21863)

এবার সিদ্ধিদাতা মহারাজ গণেশের মাথা ও মুখমণ্ডল নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। গণেশ হচ্ছেন মহাদেব শিব এবং পার্বতীর পুত্র। গণেশের জন্ম হবার পরে অনেক দেবতার সঙ্গে দেবতা শনিও দেখতে এসেছিলেন নবজাতককে। শনির স্ত্রী কোনো এক কারণে একসময় তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, তিনি যার দিকে দৃষ্টি দেবেন, তারই সর্বনাশ হবে। তাই শনি নবজাতকের চেহারা দেখতে চান নি। কিন্তু পার্বতীর একান্ত পীড়াপীড়িতে তিনি বাধ্য হন শিশুর দিকে তাকাতে। শনির দৃষ্টি শিশুমুখে পড়ামাত্র শিশুটির মুণ্ড দেহচ্যুত হয়ে যায়। খবরটি স্বর্গে মহাপ্রভু বিষ্ণুর কাছে যখন পৌছুল তিনি অতিসত্বর চলে আসার পথে মাঠে একটা হাতিকে শুয়ে থাকতে দেখে সুদর্শন চক্রের সাহায্যে সেটির মাথা কেটে নিয়ে এলেন আর গণেশের গলার সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। একদম পুরোপুরি 'প্লাষ্টিক সার্জারি'।

গণেশের মাথা নিয়ে আরো অনেক রকমের কাহিনি আছে যেমন;
শিবের প্রতি কশ্যপের অভিশাপের ফলে গণেশের মুণ্ডচ্ছেদ ঘটেছিল। - ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ।

পার্বতী যখন আট মাসের গর্ভবতী তখন সিন্দুর নামে এক দৈত্য পার্বতীর গর্ভে প্রবেশ করে গণেশের মস্তকচ্ছেদন করেছিলেন। - স্কন্দ-পুরাণ।

শুধু প্রধান মন্ত্রী মোদীই নন আরো অনেক হিন্দু ভাববাদী বৈজ্ঞানিক দাবি করছেন যে, আজকের আধুনিক বিজ্ঞান যা নতুন নতুন আবিষ্কার করছে তার সব কিছুই প্রাচীনকালের মুনি ঋষিরা বের করে তাদের ধর্মগ্রন্থে লিখে গেছেন। তারা উদাহরণও দিয়েছেন যেমন;

- মহাভারতে কৃষ্ণ অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন তা 'বিগ ব্যাং' ছাড়া অন্য কিছু নয়।

- 'ব্রহ্মার এক মুহূর্ত পৃথিবীর সহস্র বছরের সমান' এ বাক্য থেকে 'কৃষ্ণ গহ্বর' কিংবা 'সময়ের ধারণা' পাওয়া যায়।

- মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল আসলে এক 'পারমাণবিক যুদ্ধ' (Atomic War)। সম্ভবত দুর্যোধনেরই কোনো মিত্রশক্তি পারমাণবিক যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে থাকবে মহেঞ্জোদারোতে।

- দ্রোণ-দ্রোণী, কৃপ-কৃপীর জন্মের পৌরাণিক কাহিনিগুলো প্রমাণ করে Test tube baby) আর বিকল্প মা (Surrogate mother) এর ধারনা প্রাচীন যুগের ঋষিদের ছিল।

- হিন্দু পুরাণে বর্ণিত 'বরুণ বাণ' আর 'অগ্নিবাণ' উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত স্কাড আর প্যাট্রিয়ট মিসাইল ছাড়া আর কিছু নয়।

মহারাজ গণেশের গজমুণ্ডধারনের কাহিনি আমরা জানলাম, এবার তার জন্ম নিয়ে কিছু কথা। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গণেশ খণ্ডে আছে – বিষ্ণুর ইচ্ছায় মহাদেবের পুত্র হিসাবে গণেশের উৎপত্তি হয়েছিল ভিন্নতর পরিমণ্ডলে। বিষ্ণু বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহাদেব (শিব) ও পার্বতীর মিলনের ফলে পার্বতী যদি গর্ভবতী হন, তাহলে পার্বতী একটি অতিকায় দেব-পীড়নকারী পুত্র প্রসব করবেন। এই অনিষ্টকারী পুত্রের জন্মরোধের উদ্দেশ্যে বিষ্ণু একটি কৌশলের আশ্রয় নেন। শিব-পার্বতীর সঙ্গমের শেষ মুহূর্তে, বিষ্ণু দরিদ্র ব্রাহ্মণ বেশে মহাদেব- পার্বতীর মিলনগৃহের সামনে উপস্থিত হন এবং উচ্চস্বরে ভিক্ষা প্রার্থনা করতে থাকেন। শিব ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণুর সম্মানার্থে সঙ্গমকাম দ্রুত সেরে মিলনগৃহ ত্যাগ করেন, এর ফলে তাঁর স্খলিত শুক্র বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই স্খলিত শুক্র থেকেই গণেশের জন্ম হয়।

পুরাণ মতে যোনীর বাহিরে নিক্ষিপ্ত বীর্য থেকে প্রচুর দেব দেবীর জন্ম হয়েছিল। আমরা তাদের জন্ম বৃত্তান্ত পরিচিতি পরে জেনে নিবো। তার আগে মহাদেব শিব ও পার্বতীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নেয়া যাক।

পার্বতীর পিতার নাম ছিল দক্ষ। তিনি জীব-সৃষ্টা দশ প্রজাপতির একজন। দক্ষের কন্যা সতীর (পার্বতির ওপর নাম) সাথে শিবের বিবাহ হয়। শিব তার শ্বশুর দক্ষকে খুব একটা সম্মান দেখাতেন না। জামাতার হেন কাণ্ডে, শ্বশুর দক্ষ বিরূপ হয়ে উঠেন। সতীর বিবাহের এক বৎসর পর, দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। এই যজ্ঞে দক্ষ তার জামাতা মহাদেব (শিব) ও কন্যা সতীকে দাওয়াত দিলেন না। সতী বিষয়টা জানতে পেরে অযাচিতভাবে যজ্ঞে যাবার উদ্যোগ নেন। মহাদেব তাঁর স্ত্রী সতীকে বাধা দেয়ায় সতী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর মহামায়ার দশটি রূপ প্রদর্শন করে মহাদেবকে বিভ্রান্ত করেন।

এই রূপ দশটি ছিল-কালী, তারা, রাজ-রাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামূখী, মাতঙ্গী ও মহালক্ষ্মী।

শেষপর্যন্ত শিব সতীকে তার পিতার যজ্ঞানুষ্ঠানে যাবার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু যজ্ঞস্থলে পিতা দক্ষ তার মেয়ের সামনেই শিবের নিন্দা করলে- সতী তা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন। সতীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের জটা ছিন্ন করে ফেলেন। সেই জটা থেকে বীরভদ্র নামক এক শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। এরপর এই বীরভদ্র মহাদেবের অন্যান্য অনুচরসহ তার আদেশে দক্ষের যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান পণ্ড করে দেন এবং দক্ষের মুণ্ডুচ্ছেদ করেন। শিবের শাশুড়ি বীরিণী তার স্বামী দক্ষের মৃত্যুতে আকুল হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। এরপর ব্রহ্মার অনুরোধে মহেশ্বর শিব, তার শ্বশুর দক্ষের ঘাড়ে একটি ছাগলের মুণ্ডু স্থাপন করেন।

সতীর দেহত্যাগের পর, স্ত্রী শোকে কাতর ভোলানাথ শিব তাঁর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করেন। এর ফলে সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হলে, বিষ্ণু তাঁর চক্র দ্বারা সতীদেহকে একান্নভাগে বিভক্ত করে দেন। এই একান্নটি খণ্ড ভারতের বিভিন্নস্থানে পতিত হয়। পতিত প্রতিটি খণ্ড থেকে এক একটি মহাপীঠ উৎপন্ন হয়। সতীর দেহাংশ যে সকল স্থানে পতিত হয়েছিল, মহাদেব সেখানে লিঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত হলেন। বিশেষ

করে সতীর মস্তিষ্ক পতিতস্থানে শিব শোকাহত অবস্থায় উপবেশন করেন। এইসময় দেবতারা সেখানে উপস্থিত হলে- শিব লজ্জায় প্রস্তর-লিঙ্গে রুপান্তরিত হন। পরে দেবতারা এই লিঙ্গরূপী মহাদেবকে পূজা করতে থাকেন। হিন্দু পুরাণে মহাদেবের এই লিঙ্গপ্রতীক শিবলিঙ্গ নামে পরিচিত। সতীর পূনর্জন্ম হয় হিমালয়ের গৃহে। এরপর থেকে সতীর বিবর্তনীয় নাম হয় পার্বতী।

দ্রোণাচার্যঃ

দ্রোণাচার্য মহাভারত মহাকাব্যের একটি চরিত্র। তিনি কৌরব এবং পঞ্চপাণ্ডবের অস্ত্রশিক্ষার গুরু ছিলেন। একদা মহর্ষি ভরদ্বাজ গঙ্গায় স্নানের সময় অপ্সরা ঘৃতাচী'কে দেখে উত্তেজিত হন এবং তাঁর বীর্য স্খলিত হয়। তিনি সেই বীর্য এক কলসে সংরক্ষণ করেন। সেই কলস থেকে দ্রোণের জন্ম হয়। কলসের মধ্যে জন্মলাভ করায় তিনি পুত্রের নাম রাখেন দ্রোণ (কলস)।
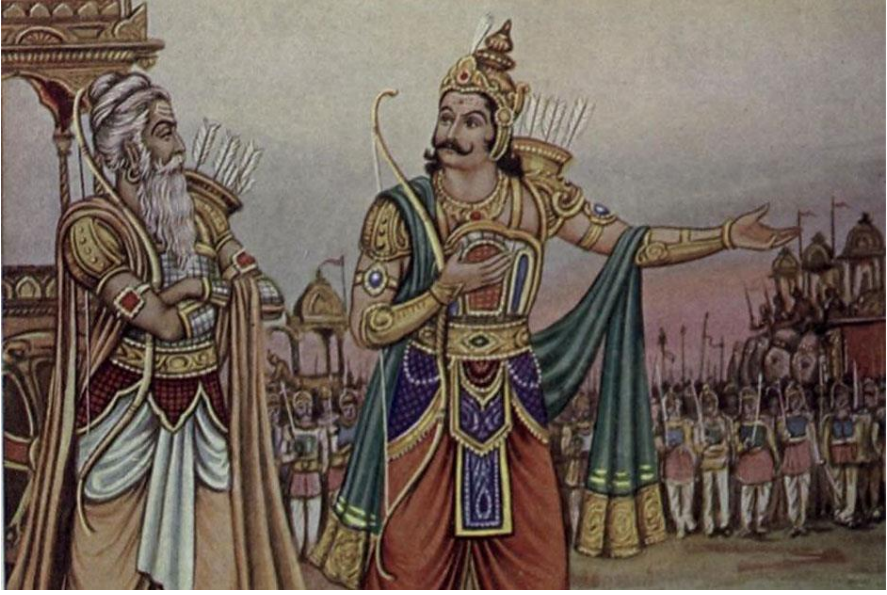
দেবী সরস্বতীঃ

ঋগবেদে দুই ধরনের সরস্বতীর উল্লেখ আছে। একটি ত্রিলোক্য ব্যাপিনী সূর্যাগ্নি, অন্যটি নদী। ঋগবেদে এবং যর্জুবেদে অনেকবার ইড়া, ভারতী, সরস্বতীকে একসঙ্গে দেখা যায়। বেদের মন্ত্রগুলো পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সরস্বতী মূলত সূর্যাগ্নি। দেবীভাগবতে সরস্বতী জ্যোতিরূপা। ভৃগুপনিষদে জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী ও জলময়ী সরস্বতীর সমীকরণ করা হয়েছে। এই উপনিষদে জলে জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত, জ্যোতিতে জল প্রতিষ্ঠিত। রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি যখন ক্রৌঞ্চ হননের শোকে বিহবল হয়ে পড়েছিলেন, সে সময় জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী তার ললাটে বিদ্যুৎ রেখার মত প্রকাশিত হয়েছিলেন। ঋগবেদ ইন্দ্রের সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠ তেমনি ঘনিষ্ঠ মরুদ ও অশ্বিনীদ্বয়ের সঙ্গে। সরস্বতী কখনো ইন্দ্রের পত্নী আবার কখনো শত্রু, কখনো-বা ইন্দ্রের চিকিৎসক। সরস্বতীর আর এক নাম ভারতী। সরস্বতীকে ব্রহ্মার মানসকন্যা হিসাবে কল্পনা করা হয়।

হিন্দু পুরাণে বলা হয়েছে, ব্রহ্মা তাঁর কন্যার সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হন। সরস্বতীর সঙ্গে ব্রহ্মার এই সম্বন্ধের সন্ধান ঋগবেদেও পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক এন এস ভট্টসারি একটি লেখায় বলেছেন, "একসময় ইন্দ্রের শরীরের শক্তি চলে যাওয়ার ফলে তিনি মেষ আকৃতি গ্রহণ করেন। সে সময় ইন্দ্রের চিকিৎসার দায়িত্ব ছিল স্বর্গের অশ্বিনীদ্বয়ের উপর এবং সেবা-শুশ্রুষার ভার ছিল সরস্বতীর হাতে। সংগীত ও নৃত্যপ্রেমী ইন্দ্র সরস্বতীর গানবাজনা ও সেবায় সুস্থ হওয়ার পর তাকে মেষটি দান করেন। সেই থেকেই সরস্বতীর সঙ্গী এই মেষ। তাহলে কি সরস্বতী স্বর্গের সেবাদাসীও! সরস্বতীর বাহন বরাহ (শুয়োর), কারণ তিনি নাকি বিষ্ণুরও স্ত্রী ছিলেন। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচিত 'সরস্বতী' গ্রন্থটিতে এ তথ্য পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকেও স্বামী হিসাবে কামনা করেছিলেন তিনি "ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিনী"।

'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'এ শ্রীকৃষ্ণ-সরস্বতীর কেচ্ছাকাহিনি যথাযথভাবেই বর্ণিত আছে। ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী 'নারী' প্রবন্ধে বলেছেন, সরস্বতী গণেশেরও স্ত্রী। মহারাষ্ট্রের কোনো

কোনো পূজারী মনে করেন, গণেশের পত্নী সরস্বতী কিংবা সারদা। আরেক তথ্য অনুসারে জানা যাচ্ছে, দুর্গার কন্যা এই সরস্বতী দুর্গার কুমারী সত্তা। আবার বাঙালিরা মনে করেন গণেশ ও সরস্বতী ভাইবোন, দুর্গার সন্তান। ব্রহ্মা তাঁর কন্যা সরস্বতীর প্রতি দুর্ব্যবহার করলে শিব তাঁকে শরবিদ্ধ করে হত্যা করেন। তখন ব্রহ্মার পত্নী গায়ত্রী কন্যা সরস্বতীকে নিয়ে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যা শুরু করেন। তাঁদের দীর্ঘ তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব ব্রহ্মার প্রাণ ফিরিয়ে দেন।

যুগে যুগে ইতিহাসবিদরা জানিয়েছেন উপাসনালয় থেকে গণিকালয় সর্বত্র পুজো পায় সরস্বতী। সরস্বতী তাঁর কৌমার্য হারিয়েছেন বহু পুরুষের বাহুডোরে। ব্রম্মা যেমন তার সুন্দরী মেয়ে সরস্বতীর প্রেমে পড়েছিলেন, মহাদেব শিবের দেহেও তার সুন্দরী যুবতি মেয়ে মনসার রূপে কাম বাসনা জেগে উঠেছিল। চলুন জেনে নিই দেবী মনসার জন্মকাহিনি।

মনসার পিতার নাম শিব। কিন্তু মা ছাড়াই মনসার জন্ম হয়। শিব সর্বভারতীয় প্রধান দেবতা। আর্যদের সাথে অনেক কুস্তি-দুস্তি করে, প্রবল ঘাতপ্রতিঘাতের পর অগ্নি, বরুণ, মিত্র, বৃহস্পতি, পুষণ, ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু-প্রমূখ বৈদিক দেবতাকে অপসারণ করে তিনি

সর্বভারতীয় প্রধান দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হন। এতে বড় বিজয়টা হয়েছে অনার্য ভারতীয় ভুমিপুত্রদের। শিব ভারতমাতার অনার্য দ্রাবিড় জাতির সৃষ্টি, আর্যদের বেদে শিবের নাম উল্লেখ নেই। যদিও তারা রুদ্রকে শিবই মনে করেন। শিবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তাঁর তৃতীয় নয়ন। মহাভারতে শিবকে ত্রিনয়ন রূপে কল্পনা করা হয়েছে; তাই উক্ত নামটির আক্ষরিক অর্থ করা হয়ে থাকে "তৃতীয় নয়নধারী"। এই নয়ন দ্বারা শিব কাম-দেবকে ভস্ম করেছিলেন। শিবকে বহু জায়গায় বহুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই যে মনসা, তিনিও প্রথমে সর্বপ্রধান দেবতা শিবের কন্যা ছিলেন না। হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদী মূলধারায় মনসা দেবীরূপে স্বীকৃতিলাভ করতে অনেক কাঠখড় পুড়েছে। ব্রহ্মা তাঁকে সর্প ও সরীসৃপদের দেবী করে দেন। মনসা মন্ত্রবলে বিশ্বের উপর নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। এরপর মনসা শিবের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করেন। শিব তাঁকে কৃষ্ণ-আরাধনার উপদেশ দেন। মনসা কৃষ্ণের আরাধনা করলে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে তাঁকে সিদ্ধি প্রদান করেন এবং প্রথামতে তাঁর পূজা করে মর্ত্যলোকে তাঁর দেবীত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। কশ্যপ জরুৎকারুর সঙ্গে মনসার বিবাহ দেন। 'মনসা তাঁর অবাধ্যতা করলে, তিনি মনসাকে ত্যাগ করবেন', এই শর্তে জরুৎকারু মনসাকে বিবাহ করেন। একদা মনসা দেরী করে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করলে তাঁর পূজায় বিঘ্ন ঘটে। এই অপরাধে জরুৎকারু মনসাকে ত্যাগ করেন। পরে দেবতাদের অনুরোধে তিনি মনসার কাছে ফিরে আসেন এবং আস্তিক নামে তাঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মায়।

আগে জানতাম দুনিয়ায় বাইবেলের মাতা মেরির পুত্র যিশুই একমাত্র বাপ-নাই সন্তান। মহাভারতে দেখি এটা কোনো ব্যাপারই না খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এখানে বাপ হীন মা হীন সন্তানের কোনোই অভাব নাই। মা ছাড়াই মনসার জন্ম কেমনে হলো?

পুরাণ অনুসারে তিনি ঋষি কশ্যপের কন্যা। একদা সর্প ও সরীসৃপগণ পৃথিবীতে কলহ শুরু করলে কশ্যপ তাঁর মন থেকে মনসার জন্ম দেন। মন থেকে মনসার জন্ম হওয়ায় তার নাম হলো 'মনসা'। এখানে বীর্যও নেই জরায়ুও নেই। ঋষি কশ্যপ মন থেকে বলেছেন শুধু হও ব্যস হয়ে গেল। মনসাবিজয় কাব্য থেকে জানা যায়, বাসুকির মা

একটি ছোটো মেয়ের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। শিবের বীর্য এই মূর্তি স্পর্শ করলে মনসার জন্ম হয়। কে এই বাসুকি? বাসুকি মহাভারত মহাকাব্যে উল্লিখিত সর্পকুলের রাজা অর্থাৎ নাগরাজ। বাসুকি মহাদেব শিবের সর্প। সে দেবতা শিবের গলা পেঁচিয়ে থাকে। হিন্দু পূরান অনুযায়ী দেবতারা সমুদ্র মন্থনের জন্য বাসুকিকে রজ্জু হিসাবে ব্যবহার করেছিল। বৌদ্ধ পূরাণেও বাসুকির উল্লেখ দেখা যায়। কশ্যপ ও তাঁর স্ত্রী কদ্রুর জ্যেষ্ঠ নাগ-পুত্র (অনন্তনাগ, শেষনাগ ও বাসুকি - তিন নামেই ইনি পরিচিত)। মাতা কদ্রুর অন্যায় আদেশ অমান্য করায় কদ্রু অনন্তকে শাপ দেন যে, তিনি জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞে দগ্ধ হয়ে মারা যাবেন। নানা পবিত্র তীর্থে কঠোর তপস্যার পর অনন্তনাগ ব্রহ্মার দেখা পান। ব্রহ্মা ওঁকে বলেন, বন-সাগর-জনপদাদি-সমন্বিত চঞ্চল পৃথিবীকে নিশ্চল করে ধারণ করতে। অনন্ত (শেষ) নাগ পাতালে গিয়ে মাথার ওপর পৃথিবী ধারণ করলেন।

সাপের মাথার উপর পৃথিবী? ব্রহ্মার অশীর্বাদে গরুড় তাঁর সহায় হলেন এবং পাতালের নাগগণ তাঁকে নাগরাজ বাসুকিরূপে বরণ করলেন। পুরাণ মতে, নাগদের মধ্যে ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনি পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। ইনি যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তখন সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হয়। এখানে বোধ হয় ভুমিকম্পের একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পাওয়া গেল। বাসুকি তাঁকে (মনসাকে) নিজ ভগিনীরূপে গ্রহণ করেন।

আবার মঙ্গলকাব্য অনুযায়ী; প্রেমে মগ্ন মহাদেব শিব একদিন পার্বতীর কথা চিন্তা করে করে কাম চেতনায় বীর্য বের করে দেন। সেই বীর্য পদ্ম পাতার ওপরে রাখেন। বীর্য পদ্মের নাল বেয়ে পাতালে চলে যায়। সেখানে সেই বীর্য থেকেই মনসার জন্ম। পদ্মপাতায় মনসার জন্ম হওয়ায় তার আরেক নাম পদ্মাবতী। মনসা বড় হন বাসুকির কাছে। শিবের পত্নী পার্বতী মনসাকে শিবের উপপত্নী মনে করেন। তিনি মনসাকে অপমান করেন এবং ক্রোধবশত তাঁর একটি চোখ দগ্ধ করেন। পরে শিব একদা বিষের জ্বালায় কাতর হলে মনসাই তাঁকে রক্ষা করেন। একবার পার্বতি মনসাকে পদাঘাত করলে মনসা তাঁর বিষদৃষ্টি হেনে পার্বতীকে অজ্ঞান করে দেন। শেষে মনসা ও পার্বতির কলহে হতাশ হয়ে শিব মনসাকে পরিত্যাগ করেন। দুঃখে শিবের চোখ থেকে কয়েক ফোটা জল পড়ে আর সেই জলে জন্ম হয় মনসার সহচরী নেতার (মনসার ভাষায় নিতী)। এখানেও বীর্য নেই যোনী নেই, শুক্রাণু নেই ডিম্বানুও নেই এ সব ছাড়াই জন্ম নিলেন মনসার সহচরী নেতা।

আমরা আরো কিছুক্ষণ হিন্দু ধর্মের আরো কিছু দেব-দেবীদের জন্মবৃত্তান্ত ও তাদের পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নিয়ে এই ধর্মের নিয়ম কানুন, বিধি-বিধান, রীতি-নীতি নিয়ে আলোচনায় মনোনিবেশ করবো।

দেবী দুর্গাঃ

বলা হয় দেবী দূর্গাই সৃষ্টির মূল কারণ। মুসলমানদের যেমন নবি মুহাম্মদই সৃষ্টির আদি কারণ। তবে এখানে ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। এই ধর্মে মুহাম্মদের ভুমিকায় আরেকজন আছেন তার কথা পরে আলোচনায় আসবে। কোরানে বর্ণিত ফেরেস্তা শিরোমণি আজাজিল আল্লাহর খুব প্রিয় ফেরেস্তা ছিল। আল্লাহর কথা অমান্য করায় এক পর্যায়ে যখন অভিশপ্ত হয়ে আজাজিল থেকে শয়তান নাম ধারণ করে বেহেস্ত থেকে বিতাড়িত হয় তখন সে আল্লাহর কাছে অলৌকিক শক্তি ও অমরত্ব দাবি করেছিল। আল্লাহ তা মঞ্জুরও করেছিলেন। এখানেও প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে। একদিন ভগবান ব্রহ্মা দৈত্যরাজ মহিষাসুরের কিছু ভাল কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর দিতে চাইলেন। দৈত্যরাজ অমরত্ব বর প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা সরাসরি অমরত্ব বর না দিয়ে তাকে এই বর দিলেন যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোনো পুরুষের হাতে তার মৃত্যু হবে না। বিশ্ব বহ্মাণ্ড স্রষ্ঠা ব্রহ্মার নিকট এমন বর পেয়ে মহিষাসুর নিজেকেই ব্রহ্মা ভাবতে শুরু করে দিলেন। মহিষাসুরের অত্যাচার দিনদিন বেড়েই চললো। দৈত্যরাজের মনে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জয় করার বাসনা জেগে উঠলো। তার প্রবল অত্যাচারে স্বর্গের দেবতারা একে একে পরাজিত হতে থাকেন। এক পর্যায়ে মহিষাসুর দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে স্বর্গের দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতারণ করে নিজেই স্বর্গরাজ্য অধিকার করে নেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে দেবতারা অনন্যোপায় হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা, শিব ও অন্য সকল দেবতাকে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে আসেন।

দেবতারা অবগত আছেন যে, দৈত্যরাজ মহিষাসুরকে ব্রহ্মার দেয়া বরের কারণেই কোনো পুরুষ তাকে বধ করতে পারবেনা। তাহলে উপায়? বুদ্ধিমান বিষ্ণু এর একটা উপায় বের করে দিলেন। বললেন ‘এই পরাক্রমশালী অসুরকে বধ করতে হলে নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়ে নিজ নিজ তেজের কাছে প্রার্থনা করতে হবে যে তাঁদের মিলিত তেজ থেকে যেন এক নারীমূর্তির আবির্ভাব হয়। বিষ্ণুর কথা মতো দেবতারা নিজ নিজ বউয়ের সাথে কাম শুরু করে দিলেন। কামের সময়ে দেবতাদের দেহ থেকে

যে তেজ নির্গত হয়েছিল সেই তেজ থেকে সৃষ্টি হয় এক অপরূপা সুন্দরী দেবীর। তিনিই আমাদের দেবী দুর্গা। যেসকল দেবতাদের দেহ থেকে তেজ নির্গত হয়েছিল, তার মধ্যে ছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু ও ইন্দ্র। বুঝা গেল দেবী দূর্গাও প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে জন্ম গ্রহণ করেন নি, তার জন্মের জন্যে শুক্রাণু আর ডিম্বানু, মাতৃগর্ভ আর জরায়ুর প্রয়োজন হয় নি। চারজন মহাপরাক্রমশালী দেবতাদের তেজ থেকে জন্ম নেয়া দেবীর তেজ কেমন হবে তা বলাই বাহুল্য। তিনি দৈত্যরাজ মহিষাসুরকে বধ করতে সক্ষম হলেন।

তবে এখানে কিছু প্রশ্ন তো থেকেই যায়। তেজ জিনিসটা কী? যদি তা আধ্যাত্মিক বা রূপক অর্থে হয় তাহলে নিজ নিজ বউয়ের সাথে মিলন এর অর্থ কী?

দেবী দুর্গার অনেক নাম- মহিষাসুরমর্দিনী, মহামায়া, জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, শূলিনী, কালী, বিপদনাশিনী, সন্তোষী, গন্ধেশ্বরী, শাকম্ভরী, বনদুর্গা, কাত্যায়নী ইত্যাদি।

দেবী দুর্গার হাত ১০টি। তাঁর ১০ হাত বলেই তাঁকে দশভুজা বলা হয়। তাঁর ১০টি হাত ও তিনটি চোখ রয়েছে। এ জন্য তাঁকে ত্রিনয়না বলা হয়। তাঁর বাঁ চোখ চন্দ্র, ডান চোখ সূর্য এবং কপালের ওপর অবস্থিত চোখকে জ্ঞানচোখ বলা হয়। তাঁর হাতে ১০টি অস্ত্র রয়েছে। সবচেয়ে শক্তিধর প্রাণী সিংহ তাঁর বাহন। দেবী হিসেবে দুর্গার গায়ের রং অতসী ফুলের মতো সোনালি হলুদ। তিনি তাঁর ১০ হাত দিয়ে দশদিক থেকে অকল্যাণ দূর করেন এবং আমাদের কল্যাণ করেন। দেবী দুর্গার ডান দিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো যথাক্রমে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, বাণ ও শক্তি নামক অস্ত্র। বাঁ দিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো যথাক্রমে শঙ্খ, ঢাল, ঘণ্টা, অঙ্কুশ ও পাশ। এসব অস্ত্র দেবী দুর্গার অসীম শক্তি ও গুণের প্রতীক।

লক্ষী ও অলক্ষ্মী দেবীঃ

এ দুজন দেবী একে অপরের সহোদর বোন। লক্ষী ও অলক্ষ্মীর জন্ম-সংক্রান্ত অনেকগুলি উপাখ্যান রয়েছে। একটি উপাখ্যানের মতে, লক্ষ্মী প্রজাপতির মুখের আভা থেকে জন্ম নেন, এবং অলক্ষ্মী জন্ম নেন প্রজাপতির পৃষ্ঠদেশ থেকে। অপর একটি উপাখ্যান অনুযায়ী, লক্ষ্মীর জন্ম সমুদ্রমন্থনের সময়। এই সময় বাসুকি নাগের মুখনিসৃত কালকূট বিষ থেকে অলক্ষ্মীর জন্ম হয়। লক্ষী মঙ্গলের আর অলক্ষী অমঙ্গলের দেবী।

দেবতাদের মধ্য থেকে আমরা একজন দেবতার পরিচয় জেনে নিবো, তিনি হলেন দেবরাজ ইন্দ্র। বাংলার স্বশিক্ষিত দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচয়ে লিখেন;

“সাধারণত হিন্দুরা 'ভগবান' এ নামটিকে ঈশ্বর-এর উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করে থাকে। আসলে ভগবান, ঈশ্বর, পরমেশ্বর বা নিরাকার ব্রহ্ম এক কথা নয়। ‘ভগবান' হচ্ছে দেবরাজ ইন্দ্রের একটি কুখ্যাত উপাধি মাত্র। ইন্দ্র ছিলেন শৌর্য-বীর্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অতি উন্নত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। তাই তাঁর একনাম ‘দেবরাজ। কিন্তু দেবরাজ হলে কি হবে, তাঁর যৌন চরিত্র ছিলো নেহায়েত মন্দ। তিনি তাঁর গুরুপত্নী অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করায় গুরুর অভিশাপে তাঁর সর্বাঙ্গে এক হাজার ‘ভগ স্ত্রৗযোনি) উৎপন্ন হয় এবং তাতে ইন্দ্রের নাম ‘ভগবান' (ভগযুক্ত) হয়। অতঃপর উক্ত ভগ চিহ্নগুলো চক্ষুরূপ লাভ করলে ইন্দ্রের আর এক নাম হয় সহস্রলোচন। ভগবান শব্দটি হচ্ছে ইন্দ্রের ব্যভিচারের একটি স্মারকলিপি, নিন্দনীয় বিশেষণ। কিন্তু কুখ্যাত ভগবান আখ্যাটি পেয়েও তিনি তাঁর ব্যভিচারে ইস্তফা দেননি। কিকিন্ধ্যার (মধ্যভারত) অধিপতি রক্ষরাজের পত্নীর গর্ভে ‘বালী রাজের জন্ম হয়েছিলো ভগবান ইন্দ্রের ব্যভিচারের ফলে। ভগবান ইন্দ্রের শেষ দেখা পাই আমরা পুরাণের পাতায় – হস্তিনাপুরে (পুরাতন দিল্লীতে) পাণ্ডুপত্নী কুন্তির গৃহে। সেখানে তাঁর অবৈধ যৌনাচারের ফলে কুন্তির গর্ভে জন্মলাভ করেন তৃতীয় পাণ্ডব ‘অর্জুন'। এখানে ভগবান ইন্দ্রের আরো কিঞ্চিৎ পরিচয় দিচ্ছি। ইন্দ্রের মাতার নাম অদিতি, পিতার নাম কশ্যপ এবং দাদা ছিলেন মরীচি। তাঁর ধর্মপত্নী শচীদেবী এবং ঔরসজাত সন্তান জয়ন্ত, ঋষভ ও সীদ্ধ। বাসস্থান ছিলো সুমেরু পর্বতের অমরাবতী নামক স্থানের এক রম্য বাগানে। স্থানটির নাম ছিলো নন্দন কানন (আলোচ্য সুমেরু পর্বত হচ্ছে হিমালয় পর্বতের অংশবিশেষ)। পাণ্ডুপত্নী কুন্তিদেবীর বাসরঘর ছাড়া দীর্ঘ তিন-চার হাজার বছরের মধ্যে - আজ পর্যন্ত কোনো পুরাণে বা নতুনে কোথায়ও ভগবান ইন্দ্রের আর দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি তাঁর বাপ, দাদা, স্ত্রী-পুত্রেরও না। হয়তো ভগবান ইন্দ্রের মৃত্যু ঘটেছে সবংশে। নতুবা তেনজিং, হিলারী ইত্যাদি আধুনিক কালের

পর্বতারোহীদের সাথে তাঁদের দেখা সাক্ষাৎ হতো। তবে ভগবান ইন্দ্র বা তার বংশাবলীর মৃত্যুও কেউ স্বচক্ষে দেখেনি, ভগবান হালদারের মৃত্যুর মতোই। সহস্র ভগ অঙ্গে থাকায় ইন্দ্রদেব ভগবান আখ্যা পেয়েছিলেন। কিন্তু মহাদেব শিবকেও 'ভগবান' বলা হয়, অথচ তার দেহে 'ভগ ছিলো না একটিও। তত্রাচ তিনি 'ভগবান' আখ্যা প্রাপ্তির কারণ হয়তো এই যে, তিনি ছিলেন ভগবতীর স্বামী। স্বয়ং 'ভগযুক্তা' বলেই দুর্গাদেবী হচ্ছেন 'ভগবতী' এবং ভগবতী-এর পুংরূপে হয়তো শিব বনেছেন ভগবান। যদি তা-ই হয় অর্থাৎ ভগযুক্তা বলে দুর্গাদেবী ভগবতী হন এবং ভগবতীর স্বামী বলে শিব ভগবান হয়ে থাকেন, তাহলে জগতের তাবৎ নারীরাই ভগবতী এবং তাদের স্বামীরা সব ভগবান। কাজেই মানুষের জন্ম ও মৃত্যু মানে ভগবতী ও ভগবানেরই জন্ম-মৃত্যু। সুতরাং জগতে যতোদিন মানুষ আছে ও থাকবে, ততোদিন ভগবতী ও ভগবান আছেন ও থাকবেন। মানুষ না থাকলে থাকবে না জগতে ভগবতী বা ভগবান এবং ঘটবে তখন জগৎব্যাপী ভগবানের তিরোধান।"। (আরজ আলী মাতুব্বর, 'ভগবানের মৃত্যু')

হিন্দু ধর্মের সকল দেব দেবীদের জন্ম বৃত্তান্ত, তাদের রূপ সৌন্দর্য, অলৌকিক শক্তি, অপরিসীম গুণাবলী ও তাদের জীবনচরিত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে সাত খন্ড রামায়ণেও কুলোবেনা। কোন দেবীকে পূজো দিলে রাজ্যের ধনসম্পদ আয়ত্বে আসবে আর না দিলে ঝাড়বংশে উজাড় হবে, লক্ষী কী করলে গৃহে আসেন আর কেন আসেন না, দিনের কোন সময়ে কোন মন্ত্র কতোবার জপ করলে কতো ধানে কতো চাল হয়, না জপলে কেমন মহামারী দেখা দেয়, কেন ক্ষেত ফসল ধ্বংস হয় এ সবই বিস্তারিত বর্ণীত আছে শাস্ত্রগ্রন্থে। ঠিক যেমন মুসলমানদের কোরান হাদিসে আছে বরকত, ফজিলত, রহমতের ফেরেস্তা, গজবের ফেরেস্তা ইত্যাদি। সকল দেব দেবীর বর্ণনায় না গিয়ে মহাভারতের কিছু বিশেষ চরিত্রের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো;

অভিমন্যু, অম্বা, অম্বালিকা, অম্বিকা, অর্জুন (পাণ্ডব), অশ্বত্থামা, অশ্বিনীকুমার, কর্ণ, কৌরব, গঙ্গা (দেবী), গান্ধারী, ঘটোৎকচ, চিত্রাঙ্গদ, চিত্রাঙ্গদা, জন্মেজয়, দুঃশলা, দুঃশাসন, দুর্যোধন, দ্রোণাচার্য, দ্রৌপদী, ধৃতরাষ্ট্র, পরীক্ষিৎ, বলরাম, বাসুকী, বাহ্লীক,

বিদুর, বেদব্যাস, ভরত (সম্রাট), ভীম, ভীষ্ম, মনসা, মাদ্রী, যুধিষ্ঠির, শকুনি, শকুন্তলা, শান্তনু, শিখণ্ডী, সঞ্জয়, সত্যবতী, সহদেব, সাত্যকি, সুভদ্রা ও হিড়িম্বা।

হিন্দু ধর্মের এক একজন দেব দেবীর একই অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভিন্ন নাম, এক জনমে এতো বিবর্তন ও বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের জন্ম বৃত্তান্তের অবাস্তব অবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন প্রকার বর্ণনার বৈপরিত্য দেখলে অবাক হতে হয়। মহাভারত পাঠে হাজারো বৈপরিত্যের মাঝে পাঠকের মনে হতে পারে তিনি এক বিশাল কিনারাহীন সমুদ্রে আছেন অথবা ঘূর্ণিবায়ুর চক্করে পড়েছেন। একই ঘটনার যে কোনো একটি বর্ণনাকে সত্য বলে মেনে নিলেও বাকি সবগুলো যে মিথ্যে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ইতিপূর্বে আমরা দেবী মনসা, পার্বতী, দেবী দূর্গা, মা কালী, কুন্তি, দেবী স্বরসতী ও দেবরাজ ইন্দ্র সম্মন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এবার মহাভারতের অত্যন্ত আলোচিত ব্যক্তিত্ব দেবী সত্যবতীকে নিয়ে কিছু কথা-

অনেকে বলে থাকেন মহাভারত ভরত বংশের ইতিহাস আর কেউ কেউ বলেন তা সত্যবতী-দ্বৈপায়ন বংশের ইতিহাস। বলা হয়, ‘যে বস্তুটি মহাভারতের গল্পে পাওয়া যায় না, তা ভারতবর্ষ তথা পুরো সংসারে কোথাও পাওয়া যাবে না’।

দেবী সত্যবতী হলেন মহাভারতে বর্ণিত হস্তিনাপুরের কুরুরাজ শান্তনুর মহিষী। তিনি কৌরব ও পাণ্ডবদের প্রপিতামহী এবং তিনি বেদব্যাসের জননী। তাঁর গায়ে তীব্র মাছের গন্ধ থাকায় তাঁর আরেক নাম 'মৎস্যগন্ধা'; এজন্য কেউ তার কাছে আসতে চাইত না। তাই তিনি তার পালকপিতার নির্দেশে যমুনার বুকে নৌকা চালানো আর জেলেনীর কাজ করতে থাকেন।

সত্যবতী মহাভারতে বিভিন্ন নামে পরিচিতা। তাঁকে দাশেয়ী, গন্ধকালী, গন্ধবতী, কালী, মৎস্যগন্ধা, সত্যা, বাসবী, যোজনগন্ধা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। হরিবংশ অনুসারে সত্যবতী তাঁর পূর্বজন্মে অচ্ছোদা নামে পিতৃগণের কন্যা ছিলেন, যিনি শাপগ্রস্তা

হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেন। মহাভারত, হরিবংশ ও দেবীভাগবত পুরাণ অনুসারে সত্যবতী শাপগ্রস্তা অপ্সরা অদ্রিকার কন্যা। অভিশাপের কারণে অদ্রিকা মৎস্যে পরিণত হয়ে যমুনায় বাস করত। একদা চেদীরাজ উপরিচর বসু বসন্তকালে বনে মৃগয়া করতে গিয়ে তাঁর ঋতুস্নাতা স্ত্রীকে স্মরণ করে স্খলিতবীর্য হন। তিনি সেই বীর্য এক শ্যেন পাখির সাহায্যে তাঁর পত্নীর উদ্দেশে পাঠান কিন্তু পথে আরেক শ্যেন পাখির সাথে যুদ্ধের ফলে সেই বীর্য যমুনার জলে পড়ে এবং অদ্রিকা তা গ্রহণ করে গর্ভবতী হয়। সত্যবতী বড় হয়ে তাঁর বাবার আদেশে ধর্মার্থে নৌকা বাইতে লাগলেন।

দেবীভাগবত পুরাণের বর্ণনা অনুসারে যখন সত্যবতী যমুনা নদীতে ঋষি পরাশরকে খেয়া পার করছিলেন তখন পরাশর তাঁর কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে তার ডান হাত ধরেন। সত্যবতী তাঁকে নিবৃত্ত করার জন্য বলেন তাঁর মত বেদজ্ঞ ঋষির পক্ষে এমন এক নারীর সহবাস প্রার্থনা অনুচিত যাঁর গা থেকে মাছের দুর্গন্ধ বের হয়। অবশেষে সত্যবতী পরাশরের জেদের কাছে হার মানেন কারণ তাঁর ভয় হয় পাছে ঋষি ক্রোধে মাঝ নদীতে নৌকা ডুবিয়ে দেন। সত্যবতী সম্মত হয়ে ঋষিকে অপেক্ষা করতে বলেন যতক্ষণ না নৌকা অপর পাড়ে পৌছায়। নৌকা পাড়ে পৌছাতেই ঋষি পূনর্বার সত্যবতীর হাত ধরেন কিন্তু সত্যবতী বলেন তাঁর গায়ে মাছের দুর্গন্ধ তাই তাঁদের মিলন সুখকর হবে না। এরফলে পরাশর সত্যবতীর দুর্গন্ধকে সুগন্ধে পরিণত করেন। যার ফলে তাঁর নাম যোজনগন্ধা হয়। কিন্তু সত্যবতী পূনরায় বলেন প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁদের মিলন হলে তাঁদের সবাই দেখে ফেলবে আর তাঁর কুমারীত্ব নষ্ট হলে সমাজ তাঁকে গ্রহণ করবে না। এতে ঋষি যমুনার কুলে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি করেন ও তাঁকে এই বর দেন তাঁর সাথে মিলন হলেও সত্যবতী কুমারীত্ব হারাবেন না এবং সে রাজপত্নী হবে। তখন সত্যবতীর মনে আর কোন সংশয় রইল না। মহাত্মা ঋষির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা আর তার ঔরসে এক বিদ্বান পুত্রকে গর্ভে ধারণ করার অভিলাষ জাগে তার মনে। ঋষি নির্বিবাদে তার সূক্ষ্ম বসন খুলে নিলেন, আর তাঁকে ক্রোড়ে নিয়ে ভূমিশয্যায় শয়ন করলেন। পরে ঋষি সম্ভোগরত হয়ে কিছুসময় সত্যবতীর অন্যান্য অঙ্গ

ভোগ করার পর, মহর্ষি তাঁর শিশ্ন তাঁর সঙ্গিনীর যোনিতে প্রবেশ করিয়ে রতিক্রীড়ায় লিপ্ত হলেন। কিছুকাল সঙ্গমের পর মহর্ষি বীর্যপাত করলেন। তারপর সত্যবতীকে তিনি ত্যাগ করলেন। তাঁদের মিলনের ফলে মহর্ষির ঔরসে গর্ভবতী হয় সত্যবতী। কিছুকাল পরে সে এক পুত্রসন্তান প্রসব করে। সেই পুত্র জন্ম মাত্রই পূর্ণতা প্রাপ্ত হল। তাঁর গায়ের রঙ কালো বলে নাম হল কৃষ্ণ আর দ্বীপে জন্ম বলে নাম হল দ্বৈপায়ন। পরবর্তীতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদকে চার ভাগে ভাগ করে বেদব্যাস নামপ্রাপ্ত হন।

দেবী সত্যবতীর সংসার নিয়ে আমরা পরবর্তিতে মহাভারত থেকে আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো। দেব দেবীর পরিচয় পর্বে এবার রয়েছেন হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত দেবী গঙ্গা।

গঙ্গা:

হিন্দুধর্মে এই দেবী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন গঙ্গায় স্নান করলে সমস্ত পাপ মুছে যায় এবং জীব মুক্তিলাভ করে। অনেকে আত্মীয়স্বজনের দেহাবশেষ বহু দূরদূরান্ত থেকে বয়ে এনে গঙ্গায় বিসর্জন দেন; তাঁরা মনে করেন, এর ফলে মৃত ব্যক্তির আত্মা স্বর্গে গমন করেন। গঙ্গার তীরবর্তী বহু স্থান হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী পবিত্র। গঙ্গার জন্মকাহিনি বিষয়ে হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে মতভেদ আছে। একটি কাহিনি অনুযায়ী ব্রহ্মার কমণ্ডলু (সন্ন্যাসীদের ব্যবহৃত মাটির বা কাঠের বা ধাতব জলপাত্র বিশেষ) এক নারীমূর্তির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ইনিই গঙ্গা। বৈষ্ণব মতানুসারে, ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলুর জল নিয়ে সশ্রদ্ধচিত্তে বিষ্ণুর পদ ধৌত করেছিলেন। বিষ্ণুর পদধৌত সেই জল থেকে গঙ্গার জন্ম। তৃতীয় একটি মত অনুযায়ী, গঙ্গা পর্বতরাজ হিমালয় ও তাঁর পত্নী মেনকার কন্যা এবং পার্বতীর ভগিনী।

মহাভারতের কাহিনি অনুসারে, রাজা সগর (ইক্ষাকু বংশীয় অযোধ্যার রাজা মহারাজ সগর) ষাট হাজার পুত্রের জনক হয়েছিলেন। (ষাট হাজার ছেলের বাবা! মহারাজ বলে কথা।) তিনি একবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে দেবরাজ ইন্দ্র তাতে ঈর্ষান্বিত হয়ে যজ্ঞের

পবিত্র ঘোড়া অপহরণ করেন। (স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র দেখি একজন লম্পটই শুধু নন একজন চোরও বটে!) মহারাজ সগর তাঁর ষাট হাজার পুত্রকে অশ্বের অন্বষণে প্রেরণ করেন। তাঁরা পাতালে ধ্যানমগ্ন মহর্ষি কপিলের ঘোড়াটিকে দেখতে পান। মহর্ষিকে চোর সন্দেহ করে তাঁরা তাঁর বহু বছরের ধ্যান ভঙ্গ করলে ক্রুদ্ধ মহর্ষি দৃষ্টিপাতমাত্র তাঁদের ভস্ম করে দেন। ষাট হাজার সন্তানকে হত্যা? এ তো গণহত্যা হয়ে গেল! সগর রাজার ষাট হাজার সন্তানের আত্মা পারলৌকিক ক্রিয়ার অভাবে প্রেতরূপে আবদ্ধ হয়ে থাকেন। পরে সগরের বংশধর, রাজা দিলীপের পুত্র ভগীরথ তাঁদের আত্মার মুক্তিকামনায় গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসার মানসে ব্রহ্মার তপস্যা শুরু করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট ব্রহ্মা গঙ্গাকে মর্ত্যে প্রবাহিত হয়ে সগরপুত্রদের আত্মার সদগতিতে সহায়তা করতে নির্দেশ দেন। গঙ্গা এই নির্দেশকে অসম্মানজনক মনে করে মর্ত্যলোক প্লাবিত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তখন ভগীরথ গঙ্গার গতিরোধ করার জন্য শিবের আরাধনা করেন। ক্রুদ্ধ গঙ্গা শিবের মস্তকে পতিত হন। কিন্তু শিব শান্তভাবে নিজ জটাজালে গঙ্গাকে আবদ্ধ করেন এবং ছোটো ছোটো ধারায় তাঁকে মুক্তি দেন। শিবের স্পর্শে গঙ্গা আরও পবিত্র হন। স্বর্গনদী দেবী গঙ্গা পাতালে প্রবাহিত হওয়ার আগে মর্ত্যলোকে সাধারণ জীবের মুক্তির হেতু একটি পৃথক ধারা রেখে যান। এইভাবে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল, তিনলোকে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা 'ত্রিপথগা' নামে পরিচিতা হোন। যেহেতু ভগীরথ গঙ্গার মর্ত্যাবতরণের প্রধান কারণ, সেহেতু গঙ্গার অপর নাম ভাগীরথী।

স্কন্দপুরাণ অনুসারে, শিব ও পার্বতীর পুত্র কার্তিকের পালিকা-মাতা হলেন গঙ্গা। একটি কাহিনি অনুযায়ী, পার্বতী তাঁর গাত্রমল হতে গণেশের মূর্তি নির্মাণ করে তা গঙ্গায় নিমজ্জিত করলে সেই মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে মনে করা হয় গণেশের দুই জননী- পার্বতী ও গঙ্গা। গণেশের অপর নাম তাই দ্বৈমাতুর বা গাঙ্গেয় (গঙ্গাপুত্র)।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে, বিষ্ণুর তিন স্ত্রী ছিলেন- লক্ষ্মী, গঙ্গা ও সরস্বতী। তাঁরা সব সময় পরস্পর কলহ করতেন বলে বিষ্ণু লক্ষ্মীকে নিজের কাছে রেখে শিবকে গঙ্গা ও ব্রহ্মাকে সরস্বতী দান করেন। হিন্দু মহাকাব্য মহাভারত অনুসারে, বশিষ্ট কর্তৃক অভিশপ্ত

বসুগণ গঙ্গাকে তাঁদের জননী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। গঙ্গা রাজা শান্তনুকে এই শর্তে পতিত্বে বরণ করেন যে গঙ্গার কোনো কাজে রাজা বাধাস্বরূপ হবেন না। একে একে অষ্টবসুর সাত জন গঙ্গাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মমাত্রেই গঙ্গা তাঁদের জলে নিমজ্জিত করে হত্যা করেন এবং তাঁরা শাপমুক্ত হন। রাজা তাঁকে বাধা না দিলেও অষ্টম সন্তান জন্মের পর শান্তনু গঙ্গাকে বাধা দিতে বাধ্য হন। এই কারণে গঙ্গার অষ্টম সন্তানটি জীবিত রয়ে যান। এই ব্যক্তিই মহাকাব্যের সর্বজনশ্রদ্ধেয় চরিত্র ভীষ্ম। কে সেই বশিষ্ট? বশিষ্ট ব্রহ্মার সপ্তম মানসপুত্র এবং প্রজাপতি। আবার অন্য মতে, কোনো এক যজ্ঞকালে, অপ্সরী উর্বশীকে দেখে যজ্ঞকুম্ভে আদিত্য ও বরুণের বীর্যপাত হয়। ফলে, যজ্ঞকুম্ভ থেকে বশিষ্ট ও অগস্ত্য-এর জন্ম হয়। সে কারণে উভয়কেই আদিত্য ও বরুণের পুত্র বলা হয়। অপ্সরী উর্বশীর রূপ যে কেমন ছিল তা পবিত্র যজ্ঞকুম্ভে এদের বীর্যপাতের ঘটনায়ই অনুমান করা যায়।

‘অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তি, তারা, মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাং স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্।।’

অর্থাৎ: অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তি, তারা ও মন্দোদরী এই পঞ্চ কন্যার নিত্য স্মরণে মহাপাপ নাশ হয়। আমরা এই পবিত্র পাঁচ কন্যা থেকে শুধু দ্রৌপদী ও অহল্যায় আলোচনা সীমিত রাখবো।

মহাভারতের কেন্দ্রীয় ও বহুল আলোচিত চরিত্র দ্রৌপদী সাধারণ কন্যা নন। সাধারণ নারীর মতো তাঁর জন্মও হয় নি। তিনি অযোনিসম্ভবা। যজ্ঞবেদী থেকে তাঁর জন্ম। তাই তিনি জন্মাবধি পবিত্র। জরায়ুর অপবিত্রতা তাকে স্পর্শ করেনি। এই হল দ্রৌপদীর প্রাথমিক পরিচয়।

মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত চৈত্ররথপর্বের ১৬৬তম অধ্যায়ে এইভাবে দ্রৌপদীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে-

“কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা।

সুভগা দর্শনীয়াঙ্গী স্বসিতায়তলোচনা।

শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী নীলকুঞ্চিতমূর্ধজা।

তাম্রতুঙ্গনখী সুভ্রূশ্চারুপীনপয়োধরা।

মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা সাক্ষাদমরবর্ণিনী।

নীলোৎপলসমগন্ধ যস্যাঃ ক্রোশাৎ প্রবায়তি।

যা বিভর্তি পরং রূপং যস্যা নাস্ত্যপমা ভুবি।

দেবদানবযক্ষাণামীপ্সিতাং দেবরূপিণীম।“

অর্থ: তখন যজ্ঞবেদী থেকে এক কুমারীও উৎপন্ন হলেন যিনি পাঞ্চালী নামে পরিচিতা হলেন। তিনি সৌভাগ্যশালিনী, সুদর্শনা এবং কৃষ্ণ আয়তচক্ষুযুক্তা। তিনি শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশাক্ষী, কুঞ্চিত ঘনকালো কেশবতী এবং তাম্রবর্ণ নখ, সুন্দর ভ্রূ ও স্তনযুক্তা। তিনি মানুষের শরীরে সাক্ষাৎ দেবী। তাঁর নীলপদ্মের ন্যায় অঙ্গসৌরভ একক্রোশ দূরেও অনুভূত হয়। তিনি পরম সুন্দর রূপধারিণী এবং সমগ্র বিশ্বে তুলনাহীনা। এই দেবরূপিনী কন্যা দেব, দানব ও যক্ষেরও আকাঙ্ক্ষিত।

পাণ্ডবদ্বেষী দুর্যোধনের চক্রান্তে একবার মাতা কুন্তিসহ পঞ্চপাণ্ডবকে বারণাবত নগরে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়। পাণ্ডব হিতৈষী বিদুরের পরামর্শে ও সাহায্যে তাঁরা কৌশলে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। প্রাণভয়ে পালিয়ে তাঁরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তাঁরা পথ চলতে থাকেন। পাছে কৌরবরা চিনতে পেরে পূনরায় ক্ষতি করে দেয়, সেই আশঙ্কায় তাঁরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে পথে পিতামহ ব্যাসদেবের সাথে দেখা হলো। ব্যাসদেব তাদের একচক্রানগরে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। পাণ্ডবগণ একচক্রানগরে দিনের বেলায় ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষা করে ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী মায়ের চরণে অর্পণ করতেন। মা সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দিতেন। এভাবেই দিন কাটছিল।

একদিন পাণ্ডবগণ লোকমুখে জানতে পারেলেন যে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ তাঁর কন্যা যাজ্ঞসেনীর (দ্রৌপদীর অপর নাম) স্বয়ম্বরসভা আহ্বান করেছেন। পাণ্ডবগণ সেই সভায় সমবেত হলেন। ঘটনাক্রমে ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন দুরূহ লক্ষভেদ করে কন্যাপণের শর্ত পূরণ করলে, পাঞ্চালরাজ তাঁর হাতে কন্যা সমর্পণ করেন। পাণ্ডবজননী কুন্তি এসব কিছুই জানতেন না। তিনি কুটিরে একা ছিলেন। ভিক্ষা থেকে ফিরে এসে ভীম-অর্জুন বাইরে থেকে ডেকে বললেন, 'মা দেখ, আজ ভিক্ষায় এক অপূর্ব জিনিস পেয়েছি'। পুত্রদের কণ্ঠস্বর শুনে মা কুটিরের ভিতর থেকেই কিছু না দেখে উত্তর দিলেন, যা এনেছ, পাঁচজন মিলে ভোগ কর।

"কুটীগতা সা ত্বনবেক্ষ্য পুত্রৌ প্রোবাচ ভুঙ্‌ ক্তেতি সমেত্য সর্বে।"

এ খবর জানতে পেরে দ্রৌপদীর বাবা রাজা দ্রুপদ এই অশাস্ত্রীয় বিয়েতে আপত্তি জানালেন। স্বয়ম্বর উপলক্ষে অনেক মুণি-ঋষি দ্রুপদ রাজ্যসভায় উপস্থিত ছিলেন। দ্রুপদের আপত্তি শুনে ব্যাসদেব বললেন, 'দ্রৌপদীর পঞ্চপতি বিধিনির্দিষ্ট।' এই বলে তিনি পুরাণের গল্প শোনালেন - ত্রেতাযুগে পূর্বজনমে দ্রৌপদী ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন। সেই জন্মে তিনি পতি কামনায় ভক্তিভরে নিত্য শিবপুজা করতেন। মাটির শিবলিঙ্গ তৈরি করে পুস্প, ঘি, মধু ইত্যাদি পঞ্চপচারে বাজনা বাজিয়ে তাঁর পুজো করতেন। পুজো শেষে, 'পতিং দেহি, পতিং দেহি' এভাবে পাঁচবার পতি প্রার্থনা করতেন। দীর্ঘকাল শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে দেবাদিদেবের পুজো করার ফলে দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব স্বয়ং ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেখা দিয়ে বললেন-'কন্যে, আমি তোর পুজোয় সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার বরে তোর পরম সুন্দর পাঁচজন পতি হবে।'

শিবের কাছ থেকে এই অদ্ভূত বর পেয়ে কন্যা চমকে ওঠেন এবং বলেন, 'হে শূলপাণি, তুমি আমাকে ঠাট্টা করছো কেন? বেদবিধি বহির্ভূত এ কোন বর দিচ্ছ?' মহাদেব স্মিতহেসে বললেন, 'কন্যে, এতে আমার দোষ কোথায়? ভেবে দেখ তুই পাঁচবার 'পতিং দেহি' বলেছিস। যতবার বলেছিস ততোবার একজন করে পতি দিয়েছি। অতএব

পঞ্চপতি তোরই চাওয়া। যা চেয়েছিস, তাই পেয়েছিস'। এই বলে মহাদেব অন্তর্হিত হলেন। কন্যা মনের দুঃখে গঙ্গাজলে দেহ বিসর্জন দিলেন। ব্যাসদেব বলে চললেন, 'সেই কন্যা পরজন্মে কাশীর রাজ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করলেন। যৌবনে বর না জোটায় আত্মগ্লানিতে তিনি কঠোর তপশ্চর্যায় রত হলেন। হিমালয় পর্বতে তাঁর সুকঠোর তপস্যায় দেবগণ মুগ্ধ হয়ে তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। পবন ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় সমবেত ভাবে বললেন, 'সুন্দরী, তুমিতো পতিলাভের আশায় এত কঠোর তপস্যা করছ? তাই যদি হয়, তুমি আমাদের এই পাঁচজনের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা বেছে নাও।' একথা শুনে কন্যা পাঁচজনের মুখপানে চাইলেন। দেখলেন, সকলেই অনিন্দ্যসুন্দর, কেউ কারো থেকে কম নয়। পাঁচজনের রূপে মুগ্ধ কন্যা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাঁচজন দেবতা তখন কন্যার মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, 'এ জন্মে তোমার কিছু হবে না। তাই এ দেহ তুমি ত্যাগ কর। পরজন্মে এই পাঁচজনকেই পতিরূপে পাবে'। দেবগণ অন্তর্নিহিত হলে ঐ কাশীরাজকন্যা তপস্যার দ্বারা দেহ ত্যাগ করলেন। এই হলো দ্রৌপদীর পূর্বজনমের কাহিনি।

গল্প শেষ করে ব্যাসদেব বললেন, 'হে দ্রুপদরাজ! সেই কন্যা আজ আপনার ঘরে দ্রৌপদী হয়ে জন্মেছেন। ধর্ম, ইন্দ্র, পবন ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্রৌপদীর পতি হওয়ার জন্য যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, অর্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেব নামে জন্মেছেন। অতএব, বুঝতে পারছেন মহারাজ! দ্রৌপদীর পঞ্চপতি বিধিনির্দিষ্ট। এর অন্যথা হওয়ার উপায় নেই।'

এ সব শুনে পাণ্ডবজননী কুন্তি চিন্তিত হয়ে বললেন, দ্রুপদ কন্যা পাঞ্চালীর (দ্রৌপদীর অপর নাম) যেন অধর্ম না হয়, সে যেন বিভ্রান্ত না হয়। মায়ের এই কথা শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কিছুক্ষণ চিন্তা করে মাকে তাঁর সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেন। তারপর অর্জুনকে বললেন, 'ভাই তুমিই তো যাজ্ঞসেনীকে (দ্রৌপদীর অপর নাম) জয় করেছ। তাই তোমারই প্রাপ্য এই রাজকন্যা। তোমার সঙ্গে মানাবেও ভালো। অতএব যথোচিত অগ্নিসাক্ষী করে তুমিই পাঞ্চালীকে গ্রহণ কর।' অর্জুন বললেন, 'হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে অধর্মভাগী করবেন না। জ্যেষ্ঠ বর্তমানে অন্যের বিবাহ অশাস্ত্রীয়। সবার আগে

আপনি যা আদেশ করবেন তাই হবে। আমরা সকলেই আপনার শাসনের অধীন।' অর্জুনের একথা শুনে পাণ্ডুপুত্রগণ সকলে দ্রৌপদীর দিকে তাকালেন। তাঁরা দ্রৌপদীর রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁদের সকলেরই মনে হল - 'কাম্যং রূপং পাঞ্চাল্যা বিধাত্রা বিহিতং স্বয়ম্ ।' - (ব্যাস-মহাভারত)। অর্থাৎ কামনা উদ্রেগকারী পাঞ্চালীর এই রূপ বিধাতা নিজ হাতে নির্মাণ করেছেন। যুধিষ্ঠির ভাইদের আচার ইঙ্গিত দেখে তাঁদের মনোভাব বুঝে নিলেন। তিনি দূরদর্শী। তাই তাঁর বুঝতে অসুবিধা হল না, দ্রৌপদীকে কোনো এক ভাই বিয়ে করলে ভ্রাতৃবিরোধ অবশ্যম্ভাবী। মহামুনি ব্যাসদেবের কথাও তাঁর মনে পড়ে গেল। ব্যাসদেব বলেছিলেন, দ্রৌপদীর পঞ্চপতি বিধিনির্দিষ্ট। অতএব সবদিক বিবেচনা করে, সর্বোপরী ভাইয়ে-ভাইয়ে বিরোধ পরিহারের উদ্দেশ্যে মতিমান যুধিষ্ঠির আদেশ দিলেন- 'সর্বেষাং দ্রৌপদী ভার্যা ভবিষ্যতি হি নঃ শুভা।' -(ব্যাস-মহাভারত)। দ্রৌপদী আমাদের সকলের ভার্যা হবে। এতে আমাদের মঙ্গল।

পাঞ্চালরাজ দরবারে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণ-বলরাম দুই ভাই। ব্রাহ্মণবেশী যুবককে লক্ষ্যভেদে সফল হতে দেখে শ্রীকৃষ্ণের মনে দৃঢ় ধারনা হল, ঐ যুবক অর্জুন ছাড়া আর কেউ নন। এদিকে দ্রৌপদীকে ব্রাহ্মণের গলায় মালা পরাতে দেখে সভায় তুমুল কোলাহল উঠল। ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে প্রবঞ্চক বলে বিদ্রোহ করলেন। তাঁরা দাবি করলেন, ক্ষত্রিয়রাজা ব্রাহ্মণকে কন্যা দিতে পারবেন না। এরকম অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ এই বলে রাজন্যবর্গকে অনুরোধ করলেন, 'ব্রাহ্মণ তো ধর্মের দ্বারাই কৃষ্ণাকে (দ্রৌপদীকে) লাভ করেছে, অতএব আপনারা নিরস্ত হন।'

এরপর কৃষ্ণ-বলরাম অলক্ষে পাণ্ডবদের অনুসরণ করে ভার্গব কর্মশালায় প্রবেশ করলেন। দ্রৌপদীকে নিয়ে পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তিসহ ভার্গবগৃহে সংসার পাতলেন। এই খবর অচিরে কৌরবরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কানে পৌঁছুল। ধৃতরাষ্ট্রের ভীম ও বিদুরের সাথে পরামর্শ করে পাণ্ডবদের যথাযোগ্য মর্যাদায় ফিরিয়ে আনলেন। ভবিষ্যৎ বিরোধ পরিহারের উদ্দেশ্যে অন্ধরাজ পাণ্ডবদের জন্য রাজ্য ভাগ করে ইন্দ্রপ্রস্থ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করে স্বাধীন ভাবে বাস করার অনুমতি দিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী

স্থাপন করার পর শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞের প্রস্তুতির জন্য শ্রীকৃষ্ণ, ময়দানব বিশ্বকর্মাকে এক চোখ ধাঁধানো অতি মনোরম অট্টালিকা নির্মাণ করে দিতে বললেন। ময়দানব অনতিবিলম্বে যুধিষ্ঠিরের জন্য এক অদৃষ্টপূর্ব রমণীয় প্রাসাদ তৈরি করে দিলেন। যজ্ঞে আমন্ত্রিত দুর্যোধন নানাভাবে অপদস্থ ও অপমানিত বোধ করলেন। বিশেষত পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য ও শ্রীবৃদ্ধি দেখে ঈর্ষায় জর্জরিত হলেন। পাণ্ডবদের সোপার্জিত ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে মামা শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ জানালেন। কপট পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির সর্বস্ব হেরে, নিজেকে পণ রেখেও হেরে গেলেন। অবশেষে শকুনির প্ররোচনায় পত্নী দ্রৌপদীকে পণ রেখেও হেরে গেলেন।

দুর্যোধন আদেশ দিলেন 'দ্রৌপদীকে এক্ষুণি এখানে নিয়ে আসা হোক্।' দ্রৌপদী সভাসদে যেতে অসম্মতি জানালেন। দুর্যোধন প্রাতীকামীকে আদেশ দিলেন- 'এখানেই দ্রৌপদীকে নিয়ে এসো।' প্রাতীকামী দূত দুর্যোধনের বাধ্যতাহেতু তাঁর আদেশ পালনে তৎপর হলেও দ্রৌপদীর ক্রোধের ভয়ে ভীত হয়ে সভ্যগণকে আবার জিজ্ঞাসা করলো, 'আমি দ্রৌপদীকে গিয়ে কী বলব?' একথার উত্তর না দিয়ে দুর্যোধন তার ভাই দুঃশাসনকে ডেকে বললেন, 'এই মূর্খ অর্বাচীন ভীমকে ভয় পাচ্ছে। দ্রৌপদীকে আনা এর কর্ম নয়। তুমি নিজে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এস।' এরপর যা ঘটল,পৃথিবীতে এতোবড় অন্যায় বোধহয় এর আগে কখনো ঘটে নি। অনেক রক্তপাত হয়েছে, অনেক নরহত্যা, ভাতৃহত্যাও ঘটেছে, কিন্তু নারীর এতোবড় অপমানের সাক্ষ্য পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও নেই।

দুঃশাসন সরাসরি দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে তাঁকে কর্কশ ও শ্রুতিকটু ভাষায় জানাল, 'কৃষ্ণা, (দ্রৌপদীর আরেক নাম) দুর্যোধন তোমাকে পাশাখেলায় জিতেছেন। তুমি এখন দুর্যোধনের দিকে দৃষ্টিপাত করো। আর লজ্জা কিসের!' একথা শুনে দ্রৌপদী যেখানে কুরুগৌরববৃদ্ধ রাজাদের স্ত্রীগণ ছিলেন, সেদিকে ছুটে গেলেন। দুঃশাসনও ক্রোধে গর্জন করতে করতে তাঁকে অনুসরণ করল। তাঁর নীল কুঞ্চিত কেশদাম ধরে টানতে লাগল। 'দীর্ঘেষু নীলেষথ চর্মিৎসু জগ্রাহ কেশেষু নরেন্দ্রপত্নীম্।'- ব্যাসদেব মহাভারতে দুঃশাসন

কর্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের কথা ঐ শ্লোকার্ধে বর্ণনা করে তাঁকে কীভাবে সভায় নিয়ে যাওয়া হল তার এক করুণ মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন।

"স তাং পরাকৃষয় সভাসমীপমানীয় কৃষ্ণামাতিদীর্ঘকেশীম্।
দুঃশাসনো নাথবতীমনাথবচ্চকর্ষ কদলীমিতাবার্তাম্।।"

দুরাত্মা দুঃশাসন কৃষ্ণার চুলের মুঠি ধরে টানতে লাগল। কৃষ্ণার পাঁচজন পতির সামনেই টানতে টানতে তাকে সভায় আনা হল। অসহায় কৃষ্ণা ক্রোধে, লজ্জায়, অপমানে, ঝরের দাপটে কলা গাছের মত কাঁপতে লাগলেন। দ্রৌপদী লজ্জায় বিব্রত হয়ে পড়লেন। তিনি ব্যাকুলভাবে করুণস্বরে আবেদন জানালেনঃ 'আমি রজঃস্বলা, একবস্ত্রে আছি। মূর্খ তুমি আমাকে সভায় নিয়ে যেওনা।' দ্রৌপদীর করুণ আর্তির উপরে নরপশু দুঃশাসন যা জানাল, তা সর্বকালের, সর্বদেশের অশ্রাব্য, জঘন্য, গর্হিতকাজ। গর্বান্ধ, মোহান্ধ ও বিজয়োল্লাসে মত্ত দুঃশাসন বলল, 'তুমি রজঃস্বলা, কী একবস্ত্রা বা বিবস্ত্রা- ওসব কাঁদুনি আমি শুনতে চাইনা। পাশা খেলায় তোমাকে আমরা জিতেছি। এখন তুমি আমাদের দাসী। দাসীর মত ব্যবহারই তোমার প্রাপ্য।' এই বলে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। নির্মমভাবে টানার ফলে তাঁর লম্বাচুলের গোছা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়ল, গায়ের আধখানা কাপড় খুলে মাটিতে লুটোতে লাগল। রাগে জ্বলে গেলেও লজ্জাবতী দ্রৌপদী সংযম অবলম্বন করে শান্তকণ্ঠে বললেন- "এই সভায় গুরুজনগণের সম্মুখে আমি এভাবে নিজেকে উপস্থাপিত করতে পারিনা। দুঃশাসনকে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন, যাতে সে যেন তাঁর আব্রু রক্ষা করে। কিন্তু দুঃশাসন সাধ্বীর কোন কথাই শুনল না। লজ্জায় কুঁকড়ে যাওয়া দ্রুপদরাজকন্যাকে যখন টেনে হিঁচড়ে সভার সামনে হাজির করানো হল, দ্রৌপদী তখন আর ক্ষোভ চেপে রাখতে পারলেন না। রাজ্যসভার সামনে তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। সভাসদ্গণের উদ্দেশ্যে বললেন,

'ধিগস্তু নষ্টঃ খলু ভারতানাং ধর্মস্তথা ক্ষত্রবিদঞ্চ বৃত্তম্।
যত্র হ্যতীতাং কুরুধর্মবেলাং প্রেক্ষন্তি সর্বে কুরবঃ সভায়াম্।।

দ্রোণস্য ভীষ্মস্য চ নাস্তি সত্ত্বং ক্ষত্তুস্তথৈবাস্য মহাত্মনোহপি।
রাজ্ঞস্তথা হীমমধর্মমুগ্রং ন লক্ষয়ন্তে কুরুবৃদ্ধমুখ্যাঃ।।

ধিক্! ধিক্! ভারতবর্ষের ধর্ম ধ্বংস হয়ে গেল। দুর্বল ও আর্তকে রক্ষা করা যে ক্ষত্রিয়ধর্ম, তাও আজ শেষ। কেননা, সভায় উপস্থিত কুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ বিনা প্রতিবাদে ধর্মের এই ভয়ানক গ্লানি দেখেছেন। এরপর মূখ্য সভাসদ্গণের নাম উল্লেখ করে বললেন, দ্রোণ, ভীম, মহাত্মা বিদুর এদের কোনো ক্ষমতাই নেই। এমন কি, রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও কোনো ক্ষমতা নেই। থাকলে এই উগ্র অধর্ম তাদের নজর এড়িয়ে যেতোনা।

শুধু প্রতিবাদ জানিয়েই দ্রৌপদী ক্ষান্ত হননি, তিনি নামোল্লেখ করে প্রত্যেকের দূর্বলতার দিকে আঙুল তুলেছেন। তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করেছেন- তাঁরা শুধুই বলিষ্ঠ সভাসদ, তাদের ধর্মরক্ষা করার ক্ষমতা নেই। এমন কি রাজাকেও তিনি ক্ষমতাহীন কাঠের পুতুল বলেছেন। দ্রৌপদীর ধিক্কারব্যাঞ্জক বাণীর সুতীব্র কষাঘাতেও সভা নীরব-নিরুত্তর রইলো। সভাসদ্গণ সকলেই অপরাধবোধে বাকশক্তিহীন হয়ে পড়লেন। দ্রৌপদীর সুনির্দিষ্ট ও সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নের কেউই উত্তর দেননি। দুঃশাসন সবলে দ্রৌপদীর বস্ত্র খুলতে লাগল। কৃষ্ণার অসহায় অবস্থা দেখে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত হলেন। নিরুপায় দ্রৌপদীও অন্য কোন উপায় না দেখে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন। লজ্জাবিব্রতা পাঞ্চালী সভার মাঝে দাঁড়িয়ে কাতরকণ্ঠে বলতে লাগলেন-

'গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপিজন প্রিয়।
কৌরবৈঃ পরিভূতাং কিং ন জ্ঞাস্যসি কেশব।।
হে নাথ, হে রমানাথ ব্রজনাথার্তিনাশন।
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দন।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেহবসীদতীম।।

অর্থাৎ: হে গোবিন্দ দ্বারকাবাসী, হে কৃষ্ণ গোপীজনবল্লভ! কৌরবরা আমাকে কীভাবে নিপীড়িত করছে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না? হে প্রভু, হে লক্ষ্মীপতি, হে ব্রজেশ্বর, হে দুঃখ নিবারক, হে জনার্দন! আমি কৌরব সাগরে ডুবে যাচ্ছি। তুমি আমাকে উদ্ধার কর। হে মহাযোগী কৃষ্ণ, তুমি জগতের আত্মা, তুমি জগৎকল্যাণকারী, কুরুসভায় ভয়ানক কষ্টে পড়ে আমি তোমার শরণ নিচ্ছি। হে গোবিন্দ তুমি আমাকে বাঁচাও।

দ্রৌপদীর এই আকুল আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ সাড়া না দিয়ে পারলেন না। তিনি অন্তরীক্ষ থেকে বিচিত্র সুবস্ত্রে তাঁর অঙ্গ ঢেকে দিতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বিচিত্র বস্ত্র শয়ে শয়ে আবির্ভূত হতে লাগল। এই অদ্ভুত ঘটনা দেখে সভার মধ্যে ভয়ানক হৈ চৈ বেঁধে গেল। সভামধ্যে শতচেষ্টা করেও দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করতে পারলনা।

‘নারদ পুরাণ’ এবং ‘বায়ু পুরাণ’ অনুযায়ী, দ্রৌপদী একাধারে ধর্ম-পত্নী দেবী শ্যামলা, বায়ু-পত্নী দেবী ভারতী এবং ইন্দ্র-পত্নী দেবী শচী, অশ্বীনিকুনারদ্বয়ের পত্নি ঊষা এবং শিব-পত্নী পার্বতীর অবতার। বিগত জন্মে তিনি ছিলেন রাবণকে অভিসম্পাত-প্রদানকারী

বেদবতী। তার পরের জন্মে তিনি সীতা। তাঁরই তৃতীয় ও চতুর্থ জন্ম দময়ন্তী এবং তাঁর কন্যা নলযানী। পঞ্চম জন্মে তিনি দ্রৌপদী।

মহাভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পরিণতি লাভ করে। এই ঘটনার প্রভাবক ছিল দুর্যোধনের পাণ্ডবদের ও দ্রৌপদীকে নিগৃহীত করার বাসনা এবং তাঁর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া।

দেবী অহল্যার জীবন কাহিনি দ্রৌপদীর মতো বিষাদভরা নয় বরং বেশ রোমাঞ্চকর। অহল্যার কিছু বর্ণনা দু'জন লেখকের কাছ থেকে জেনে নেয়া যাক।

(১)

"অহল্যা নাম্নী নারীটি অযোনিসম্ভবা অর্থাৎ কোনো নারীর থেকে তার সৃষ্টি হয়নি। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নিজ হাতে গড়া অমন তিলোত্তমা অন্য কোনো পুরুষের হয়ে উঠুক সেটিও বোধ হয় ব্রহ্মা মনে প্রাণে মানতে পারেননি তাই বুঝি অহল্যা ছিলেন চিরকুমারী এবং সেখানেই তার নামটি সার্থক। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সৃষ্ট অহল্যা নামে নারী চরিত্রটি পৌরাণিক উপাখ্যানে স্বনামধন্য হয়ে আছে অনেকগুলি কারণে,

১) তাঁর রূপ (সৃষ্টিকর্তার খেয়াল)
২) বুদ্ধি (বৃদ্ধ-স্বামীকে মানিয়ে নেওয়া ও একইসাথে দেবরাজ ইন্দ্রকেও খুশি করা)
৩) বৃদ্ধ স্বামীকে মেনে নেওয়া (পিতা ব্রহ্মার কথা লক্ষ্মী মেয়ের মত মেনে নেওয়া)
৪) অসাধারণ সিডিউসিং পাওয়ার (বৃদ্ধ, যুবক সকলকেই পটিয়ে ফেলা)
৪) ইন্দ্রের সাথে পরকীয়ার কারণে অভিশপ্ত পাথরে রূপান্তরিত হয়ে প্রকৃতিকে আঁকড়ে বেঁচে থেকে যাওয়া (চিরন্তন ভারতীয় নারীর ত্যাগ)
৫) রামায়ণের রামকে অতিথি সৎকারে অভিভূত করে অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া (কঠোর তপস্যার জন্য আর কিছুটা গৌতমমুনির ক্ষমতা প্রদর্শন) এবং এই সবগুলি

কারণে পঞ্চকন্যার আখ্যা পাওয়া। “অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তি তারা মন্দোদরী তদা, পঞ্চকন্যা স্মরে নিত্যং মহা পাতক নাশনম্।”

ব্রহ্মা যতগুলি মানসকন্যা সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টা এবং তিলোত্তমা ছিলেন এই অহল্যা। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নাকি স্বর্গের নর্তকী ঊর্বশীর রূপের দেমাগ খর্ব করার জন্যই এই অবর্ণনীয় সুন্দরী অহল্যাকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলেন। ব্রহ্মার কাছ থেকেই অহল্যা পেলেন চির-যৌবনবতী থাকার আশীর্বাদ। গৌতমমুনির কামনার স্বীকার হলেন যৌবনবতী অহল্যা। ধ্যানের বলে ব্রহ্মা জানতে পারলেন সে কথা, কিন্তু ব্রহ্মা ঘোষণা করলেন যে সারা পৃথিবী পরিক্রমা করে সর্বাগ্রে তাঁর সামনে আসবে তার সাথেই তিনি অহল্যার বিবাহ দেবেন। সেই কথা শুনে সমগ্র দেবকুল এবং মুনিঋষিরা সকলেই যাত্রা শুরু করলেন। যাত্রা-শেষে আশ্রমে ফেরার মুখে মহর্ষি গৌতম একটি গরুর বাছুর জন্ম নেওয়া লক্ষ্য করলেন। সেটি ছিল কামধেনু বা দৈব গরু। সৃষ্টির এরূপ প্রকাশ লক্ষ্য করে গৌতম সেই গোবৎসের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে সেই পরিধির মধ্যিখানে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করলেন।

ব্রহ্মা দৈববলে সে কথা জানতে পেরে গৌতমমুনিকে বললেন যে একটি গাভীর সন্তানের জন্ম দেওয়া হল পৃথিবীসহ সপ্তদ্বীপের উৎপত্তির সমতুল্য। এবং সেই গোবৎসটি প্রদক্ষিণ করে তার মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হল সারা পৃথিবী ভ্রমণের সমান। গৌতমের এরূপ কঠোর ধৈর্য দেখে ব্রহ্মার মন ভিজল। তিনি গৌতমমুনির সাথে অহল্যার বিবাহে সায় দিলেন। অসামান্য সুন্দরী অহল্যা হলেন বৃদ্ধ গৌতম মুনির যুবতী ভার্যা। ব্রহ্মা নবদম্পতিকে উপহারস্বরূপ ‘ব্রহ্মগিরি’ দান করলেন। ব্রহ্মগিরি হল নবদম্পতির আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের সর্বোচ্চ স্থান”। [ইন্দিরা মুখার্জী, ‘অন্য অহল্যা’]

(২)

“অতঃপর ব্রহ্মা এক অপরূপ রমণী তৈরি করলেন। তিনি তার নাম রাখলেন অহল্যা। অহল্যা রূপে অদ্বিতীয়া। দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যাকে দেখেই প্রেমে পড়ে গেলেন। ব্রহ্মা

ইন্দ্রের মনের কথা বুঝতে পেরে অহল্যাকে গচ্ছিত রাখলেন ঋষি গৌতমের কাছে। নির্দিষ্ট সময় পর গৌতম অহল্যাকে ফিরিয়ে দেন অক্ষত অবস্থায়। এতো সুন্দরী একটি রমণীকে পেয়েও গৌতম তাকে ভোগ করতে চায় নি বলে খুব খুশি হলেন ব্রহ্মা। খুশি হয়ে গৌতমের সাথেই বিয়ে দিয়ে দিলেন অহল্যার। গৌতম ফের অহল্যাকে নিয়ে ফিরে গেলেন মিথিলা উপবনে নিজের আশ্রমে। গৌতম সারাদিন পাহাড়ে বসে ধ্যান করেন। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরেন। আর অহল্যা সারাদিন বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। নদী তীরে হেঁটে বেড়ায়। আর ফুলবন থেকে ফুল তুলে ফুলের মালা গেঁথে এনে সাজিয়ে রাখে বিছানায় ফুলসজ্জার জন্য। কিন্তু ঋষি গৌতম এসে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ে। সারারাত বিছানায় ফুলের গন্ধ নিয়ে ছটফটে রাত কাটে অহল্যার। সকালে সেই বাসি ফুল সে ফেলে দেয়। অথচ অহল্যার নিজস্ব ফুলের কলি থাকে স্পর্শহীন আর সে কলি অবিরাম ফুল হয়ে ফুটতে চায়।

ফুলবনে অহল্যা-

ইন্দ্র অহল্যাকে ভুলে না। তার চিন্তা জুড়ে কেবল অহল্যার রূপ। মনে মনে সে কামনা করে অহল্যাকে। একদিন ইন্দ্র নেমে আসে মিথিলা উপবনে। অহল্যা তখন ফুল তুলছিল প্রচণ্ড মন খারাপ নিয়ে। ইন্দ্র গৌতম সেজে অহল্যার কাছে এলো। এসে চুম্বন করলো। জড়িয়ে ধরলো ভালোবাসা দিয়ে বুকের মাঝে গভীরভাবে। অহল্যা হয়তো বুঝে এ গৌতম নয়, ইন্দ্র। কিংবা হয়তো বুঝেনা। সে ভাবে গৌতমই তো। বস্তুর বাহ্যিক আকার দেখে মানুষ তো বস্তুর পূর্ব নির্ধারিত নামেই চেনে। একটি আপেল যদি দেখতে হুবহু ডালিমের মতো হয়, লোকে দেখে তো তাকে ডালিমই বলবে। ভেতর না দেখে কেন সে অস্বীকার করবে গৌতমকে। আর গৌতমের ভেতরও তো সে জানে না। বাহ্যিক গৌতমরূপী এ ইন্দ্র তার কাছে গৌতম ভিন্ন আর কেউ নয়। গৌতমের চুম্বনে সে সাড়া দেয়। কুটিরে নিয়ে গিয়ে সে গৌতমরূপী ইন্দ্রের পূজা করে। গৌতমরূপী ইন্দ্রও তাকে পূর্ণ করে। এভাবেই চলতে থাকে দিনের পর দিন। দুপুরে গৌতমরূপী ইন্দ্র আসে কুটিরে। অহল্যার পূজা নেয়। তারপর চলে যায়। আবার রাতে গৌতমরূপী গৌতম

আসে। বিছানায় ছড়ানো ফুল আর অহল্যার গন্ধ ছড়ানো ফুল পাশে রেখে ঘুমায়। একদিন সত্যিকার গৌতম খেয়াল করে অহল্যার শরীর জুড়ে তৃপ্তির উজ্জ্বলতা ঠিকরে পড়ছে। তার সন্দেহ হয়। তাই চুপচাপ একদিন দুপুরে সে কুটিরে ফেরে। তখন অহল্যা বস্ত্রহীন হয়ে গৌতমরূপী ইন্দ্রের শরীরে ফুলের ঘ্রাণ ছড়াচ্ছিলো। প্রকৃত গৌতম এসে দেখে আরেক গৌতম। আধবোঁজা চোখ মেলে অহল্যা দেখে দরজায় বিস্মিত চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গৌতম। প্রকৃত অর্থেই যখন দুইজন গৌতম একই সময়ে অহল্যার দৃষ্টিগত হয়, তখন তার উচিত হয় দৌড়ে এসে বস্ত্রদিয়ে নিজেকে আবৃত করা। এবং সে তাই করে। মুখোমুখি দুই গৌতমকে রেখে তার চোখ বিস্ময় প্রকাশ করে। যদিও সে জানে, কিন্তু সে জানা তো ছিল মনে মনে একার। এখন এই জানা তো আর একার না, তিনজনের। সুতরাং তাকে বিস্ময়প্রকাশ করতেই হয়।

রাম অহল্যাকে মুক্তি দেয়-

গৌতমরূপী ইন্দ্র অদৃশ্য হয়। গৌতম অভিশাপ দেয় ইন্দ্রকে। ফলে ইন্দ্রের সারা শরীর ভরে যায় যোনিতে। গৌতম অহল্যাকেও শাপ দেন, "মমাশ্রমা সমীপতঃ বিনিধ্বংস"; অর্থাৎ, 'অহল্যার চেয়েও অধিক সুন্দরী পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে তাঁর রূপের গৌরব খর্ব করবে'। অহল্যা দাবি করে যে সে নির্দোষ। সে গৌতমেরই সেবা করছিল। গৌতমই ছিলো তার মনে প্রাণে। ইন্দ্র যদি গৌতমরূপে আসে তবে তার দোষ কোথায়! এইক্ষেত্রে ইন্দ্র কর্তৃক সে ধর্ষিত হয়েছে মাত্র। গৌতম আবারো অভিশাপ দেন ইন্দ্রকে, যুদ্ধে ইন্দ্রকেও ধর্ষিত হতে হবে, আর ইন্দ্র জগতে যে ধর্ষণ প্রথার সূচনা করলেন তাঁর অর্ধেক পাপ বহন করতে হবে ইন্দ্রকেই।

তারপর গৌতম অহল্যাকেও পাথর হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দেয়। কেবল রাম এসে যদি কখনো অহল্যাকে স্পর্শ করে, তবেই সে শুদ্ধ হবে। আর তখন নিষ্কাম হয়ে আবার গৌতমের সাথে সংসার করতে পারবে। অহল্যা কুটিরে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যুগের পর যুগ। আর গৌতম পাহাড়ে থাকে ধ্যানমগ্ন। অনেকদিন পর রাম আর লক্ষণ যখন

এই কুটিরের আতিথ্যে গ্রহণ করেন। কুটিরে ঢুকে অহল্যার পা স্পর্শ করেন রাম, তখন অহল্যার পাথর জীবন শেষ হয়"।

এবার উইকিপিডিয়া থেকে-

"রামায়ণে আছে, প্রজা সৃষ্টির পর সেই প্রজাদের বিশিষ্ট প্রত্যঙ্গ নিয়ে ব্রহ্মা এক কন্যা সৃষ্টি করেন। অদ্বিতীয়া সুন্দরী ও সত্যপরায়ণা বলে ব্রহ্মা তাঁর নাম রাখেন অহল্যা। ব্রহ্মা তাঁকে গৌতম ঋষির নিকট 'ন্যাসভূতা' অর্থাৎ গচ্ছিত রেখেছিলেন। ইন্দ্র অহল্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহের মানস করেন। কিন্তু বহু বছর বাদে গৌতম অহল্যাকে ব্রহ্মার নিকট ফিরিয়ে দিলে, ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে অহল্যার সহিত গৌতমের বিবাহ দেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্র অহল্যাকে ধর্ষণ করেছিলেন। এই কারণে, গৌতম ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন যে যুদ্ধে তাঁকেও ধর্ষিত হতে হবে এবং যে ধর্ষণ প্রথার সূচনা জগতে ইন্দ্র করলেন তাঁর অর্ধেক পাপ তাঁকেই বহন করতে হবে; এবং জগতে দেবরাজের স্থানও স্থাবর হবে না।

আদিকাণ্ড-

রামায়ণের আদিকাণ্ডে অবশ্য এই উপাখ্যানটি সামান্য অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই উপাখ্যানে বলা হয়েছে, মিথিলার নিকটস্থ এক উপবনে নিজের আশ্রমে গৌতম অহল্যাকে নিয়ে বাস করতেন। একদিন মুনির অনুপস্থিতির সুযোগে, তাঁর বেশ ধরে এসে ইন্দ্র অহল্যার নিকট সঙ্গম প্রার্থনা করেন। অহল্যা তাঁকে চিনতে পারেন। কিন্তু ইন্দ্রের সঙ্গে শয়নে সম্মতও হোন। সঙ্গমতৃপ্তির পর অহল্যা ইন্দ্রকে পলায়নের উপদেশ দেন। কিন্তু পালাতে গিয়ে ইন্দ্র ধরা পড়ে যান। গৌতম স্নান করে তখন সমিধকুশ নিয়ে ফিরছিলেন। ইন্দ্রকে তিনি অভিশাপ দেন যে তাঁকে বৃষণ অর্থাৎ অণ্ডকোষহীন হতে হবে। অহল্যাকে তিনি শাপ দেন যে তাঁকে বহু সহস্র বছর "বায়ুভক্ষা, নিরাহারা, ভস্মশায়িনী, তপ্যন্তী ও অদৃশ্যা" হয়ে থাকতে হবে। রাম তাঁকে আতিথ্য দিলে তিনি পবিত্র হবেন ও কামরহিত হয়ে স্বামীর সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবেন। এরপর গৌতম

হিমবৎ পর্বতের শিখরে তপস্যায় নিমগ্ন হন। মিথিলার পথে এই উপাখ্যান শুনতে শুনতে রাম ও লক্ষ্মণ মুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। অহল্যার শাপমুক্তি ঘটে। তিনি ভস্মশয্যা থেকে উঠে এসে অতিথি সৎকার করেন। রাম ও লক্ষ্মণও তাঁর পদধূলি নেন। দেবতারা আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি ঘটান ও অহল্যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হোন। গৌতম ঋষি ফিরে আসেন এবং রামচন্দ্রকে পূজা করে স্ত্রীকে নিয়ে তপস্যা করতে চলে যান।

অন্যান্য গ্রন্থ্ মতে-

'কথাসরিৎসাগর' এ আছে ইন্দ্র ধরা পড়েন নি। তিনি 'মার্জার'-এর রূপধারণ করে পালান। গৌতম স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'মার্জার' চলে গেছে। কথাটি দ্ব্যর্থক। এক অর্থে 'মৎ-জার' অর্থাৎ আমার নিষিদ্ধ প্রেমিক, অন্য অর্থে বিড়াল।

একটি মতে, গৌতমের অভিশাপে অহল্যা পাথর হয়ে যান। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে তাঁর মুক্তি ঘটে। এক মতে, গৌতমের শাপে ইন্দ্রে সারাদেহ যোনিচিহ্নে ভরে যায়। অপর একটি মতে, অহল্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে ইন্দ্র মোরগের বেশে মধ্যরাতে আশ্রমে উপস্থিত হন ও ডেকে ওঠেন। ভোর হয়েছে মনে করে ঋষি স্নানে চলে যান। ইন্দ্র গৌতমের ছদ্মবেশে ফিরে এসে অহল্যাকে সম্ভোগ করেন। আবার অন্য একটি মতে জানা যায়, শাপমোচনের পর গৌতম পুত্র শতানন্দকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন এবং একসঙ্গে বসবাসও শুরু করেন। পদ্মপুরাণেও রামের পাদস্পর্শে অহল্যার মুক্তির কথা আছে"। [তানভীর আশিক, 'হিন্দু পুরাণ: অহল্যা উপাখ্যান']

মহাভারত ও রামায়ণ, এই দুই মহাকাব্যের দুটি অবিসংবাদিত নারী চরিত্র যথাক্রমে দ্রৌপদী ও সীতা। মহাভারতের যুগে দ্রৌপদীর স্বামী অর্জুন আর রামায়ণের যুগে সীতার স্বামী রাম, দুই মহাকাব্যের দুই মহানায়ক। বিবাহের পরে স্বামীসহ দ্রৌপদীর হয়েছিল তেরো বছর অজ্ঞাতবাস, আর সীতার চৌদ্দবছর বনবাস। পাঁচটা তাগড়া জোয়ান স্বামী, ভীরু কাপুরুষ, পুরুষ নামের কলংক, মাথা নীচু করে কপাল চাপড়ায়। জাত গেল জাত

গেল বলে হায় হায় করে, আর চোখের সামনে তাদের স্ত্রী দ্রৌপদীকে সভাসদে ন্যাংটা করানো হয়।

একটা নিরপরাধ নারীকে উলঙ্গ দেখতে উপস্থিত পাষণ্ডদের বিকৃত আনন্দে ফেটে পড়ার কী উচ্ছাস! কতো বড় নির্লজ্জ অকৃতজ্ঞ অথর্ব ছিল রাম যে, তার স্ত্রী সীতাকে সন্দেহ করে আগুনে পুড়িয়ে তার সতীত্ব পরীক্ষা করতে পারে! আরেকজন আছেন মঙ্গল কাব্যের ঊষা। কোনো কোনো গ্রন্থে বলা হয়েছে এই ঊষাই নাকি পরবর্তীতে দেবী সরস্বতীরূপে আবির্ভুত হোন। সরস্বতীকে বিভিন্ন বর্ণনায় একজন যৌনপ্রতিমা, গণিকা বা বেশ্যা যদি না'ই বলা হয় একজন Tart (বাংলায় সম্ভবত বহুগামী) রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

স্বর্গের অপ্সরা ঊষা মর্ত্যে বেহুলা হয়ে ছয়মাস স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে দেশে-দেশে ভেলায় ভাসে আর ঘাটে-ঘাটে সতীত্বের পরীক্ষা দেয়। শেষ পর্যন্ত যে মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনতে বেহুলার এতো কষ্ট, এতো ত্যাগ সেই তার আপন স্বর্গীয় স্বামী অনিরুদ্ধ (মর্ত্যের লখিন্দর) তাকে বিশ্বাস করল না। বেহুলাকে আগুনে ঝাপ দিয়ে প্রমাণ করতে হলো যে, সে অসতী ছিলো না। নারীর রূপ-যৌবন আর সতীত্ব নিয়ে স্বর্গপূরীর ভগবানদের এতো মাথা ব্যাথা কেন? কবে কয়জন পুরুষ তার সততার পরীক্ষায় আগুনে ঝাপ দিয়েছেন? বলা হয়েছে সতীসাব্ধী পবিত্র সীতার জন্ম নারীর অপবিত্র যোনীপথে হয়নি, হয়েছে মাটি খোঁড়ার লাঙ্গলের ফলায়। কী পরিমাণ জালিম কুপ্রবৃত্তির এই ধর্মগ্রন্থ লেখকেরা। একদিকে নারীকে দেবী বলে সম্মান দেখিয়ে ভণ্ডামী করে, অন্যদিকে এই নারীর যোনিকে বলে অপবিত্র! নারী দেখলেই দেবতাদের মাথায় সেক্স উঠে যায় কেন? এই যদি হয় একটি ধর্মের ঋষি, মুণি, ভগবান, দেবতাদের মন-মানসিকতা, ধ্যান চিন্তার অবস্থা, তাহলে তাদের মূলনায়ক তথা প্রধান অবতার বা পয়গম্বর বা রসুলের অবস্থা কেমন হবে? ইসলামের নবি মুহাম্মদ তো বাহিরে সুন্দরী নারী দেখলে তিনি নিজের ঘরে বউয়ের কাছে দৌড়াতেন, এরা তো দেখি সেই সময়টুকুও পান না, যত্রতত্র বীর্য ছেড়ে দেয়; আর তা থেকেই জন্ম নেয় তাদের সন্তানাদি!

চলুন এবার হিন্দু ধর্মের পয়গম্বরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। তার আগে কিছু কথা বলে নেয়া ভাল, মডারেট হিন্দুরা খুব গর্বের সাথে দাবি করেন-

'বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলির প্রতিটি ধর্মই কোনো না কোনো একক ধর্মপ্রচারকের দ্বারা প্রবর্তিত যেমন, গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন, যিশুখ্রিস্ট খ্রিস্টধর্ম এবং মুহাম্মদ ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করেন কিন্তু হিন্দুধর্ম কোনো একজনমাত্র ব্যক্তির দ্বারা প্রবর্তিত হয়নি। এটি তাদের ধর্মের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। কোনো একজন মানুষের জীবনকথা হিন্দুধর্মের ভিত্তি নয়। হিন্দুধর্মের ভিত্তি হল সেই পরম সত্য; যাঁকে ঈশ্বর নামে সকল ধর্মে পূজা করা হয়। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের ঈশ্বরদর্শনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই হিন্দুধর্মের প্রামাণিকতা। সাধারণ মানুষেরা ঈশ্বর সম্পর্কে যা অনুভব করে তা অসম্পূর্ণ। একমাত্র মহান ঋষিদের কাছেই ঈশ্বরের মহান সত্যটি প্রকাশিত হয়। প্রাচীনকালের ঋষিগণ তাঁদের এই ঈশ্বরানুভূতির কথা ধরে রেখেছিলেন এবং তা লিখে রেখেছেন 'শ্রুতি' নামে একশ্রেণির শাস্ত্রে'।

তো এখানে অনন্য বৈশিষ্ট্যের কী রয়েছে? ঘুরে-ফিরে কথাতো একই। ঈশ্বর দর্শনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অন্যান্য ধর্মের নবিদেরও রয়েছে। মুসা দেখেছেন আল্লহকে তুর পাহাড়ে, মুহাম্মদ দেখেছেন লাওহে মাহফুজে একেবারে আল্লাহর গৃহে। কোরান একজনের লেখা নয় বাইবেলও নয়, তাদের আছে 'বাণী' আপনাদের 'শ্রুতি' তাদের বাইবেল, কোরান, হিন্দুদের বেদ। মুসলমানদের কোরান থেকে হাদিস, ফিকাহ, তাফসির, সিরাত আর হিন্দুদের বেদ থেকে মনুস্মৃতি, মহাভারত, গীতা ও রামায়ণ। শাস্ত্রীয় আইন-কানুন, রীতি-নীতি, বিধি-বিধান সবই তো প্রায় একইরকম।

মুসলমানদের আল্লাহ আর হিন্দুদের ব্রহ্মা,মুসলমানদের কোরান আর হিন্দুদের বেদ, মুসলমানদের মুহাম্মদ আর হিন্দুদের মনু এই তো দুই ধর্মের স্বরূপ বা ভিত্তি। হিন্দু ধর্মের পয়গম্বরের নাম 'মনু'। তার সাথে সরাসরি ব্রহ্মার কথা হয়। তিনি জগতের মানুষকে ব্রহ্মার সৃষ্টির ম্যানুয়েল 'কিতাব' পড়ে শুনান। আসল মূল কিতাব 'বেদ'

আর্যদের তৈরি, ব্রাহ্মণ মনু সেখান থেকে চুরি করে শুদ্রদের শোষণ-শাসনের লক্ষ্যে তার মনের মতো করে বানিয়েছেন 'এ কমপ্লিট কোড অফ লাইফ' হিন্দুদের জীবন বিধান 'মনুস্মৃতি'।

'মনু' ও তার ধর্মগ্রন্থ 'মনুসংহিতা' নিয়ে 'চরৈবেতি' নামক একটি বাংলা ব্লগে লেখক অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

"ঋগবেদে মনুকে মানবজাতির পিতা বলা হয়েছে। তিনি আদিত্য বিবস্বতের পুত্র বলে বিবস্বান, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার পুত্র বলে স্বায়ম্ভুব মনু, যাস্কের নিরুক্তে মনু দ্যুস্থানীয় দেবতা, তৈত্তিরীয় সংহিতায় মনু এক পরিবারের পিতা, শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে সুপ্রসিদ্ধ মনুমৎস্যকথা অংশে তিনি মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা। তিনি মানবজাতির পিতা, তাই তিনি নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের প্রবর্তক, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, যজ্ঞানুষ্ঠানের সৃষ্টিকর্তা, শাসক ব্যবহার বিষয়ে প্রামাণ্য ব্যক্তি, মহর্ষি, বেদবিদ্যায় বিদ্বান, পৃথিবীর উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ তিনি জানেন। পুরাণ মত অনুযায়ী মনু ব্রহ্মার দেহ থেকে তৈরি হয়েছেন। সুতরাং পৃথিবীতে ভগবান ব্রহ্মার একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন মনু। যাকে স্বায়ম্ভুব মনু বলা হয়। তবে জানা গেছে ব্রহ্মার ইচ্ছায় ১৪ জন মনু জন্ম নিয়েছেন এবং এদের সবাই ধর্মশাস্ত্র

রচনা করেছেন। স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার কাছ থেকে স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করা শিখে তা তার শিষ্যদের পাঠ করান। পরবর্তীতে ভৃগু নামে একজন মনুর আদেশে এই ধর্মশাস্ত্র ঋষিদের কাছে ব্যাখ্যা করেন। যা এখন 'মনুসংহিতা' নামে পরিচিত। ভগবান ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুর দেখানো পথ অনুসরণ করে বাকি ১৪ জন মনু এই শাস্ত্র ধারণ ও পরিবর্ধন করেছেন। মূলত 'ভগবান ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু' এর বর্ণিত শ্লোকগুলিই অন্য মনুরা সম্পাদনা ও টীকা বা ব্যাখ্যা যোগ করেছেন এবং কিছু কিছু আইন ও আচরণ পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন।"

(এখানে ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে আমরা ইসলামের মুহাম্মদ ও অন্যান্য মনুকে মুহাম্মদের সাহাবি রূপে কল্পনা করতে পারি, কারণ ঘটনা একই উদ্দেশ্যে একই ধারাবাহিকতায় ঘটেছে।)

এখন প্রশ্ন হল মনু কি সত্যিই 'ভগবান' ছিলেন? মনুসংহিতার পাতাতেই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পারি। বস্তুত মনু ছিলেন একজন শাসক বা রাজা, ব্রাহ্মণ শাসক- ভগবান কখনোই নয়। ভগবান যে নয়, তার প্রমাণ মনুর সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি ৩ জায়গায় ৩ রকম বর্ণনা করেছেন।

১)

মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম থেকে উনিশতম শ্লোকে সৃষ্টিতত্ত্বে বলছেন, আদিতে এই বিশ্ব অন্ধকারময় ছিল, তার অস্তিত্ব বুঝা যেতো না, কোনো কিছুরই লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন ছিল না, প্রমাণগ্রাহ্য ছিল না। সবকিছু ছিল অবিজ্ঞেয়। যেন সবদিকে প্রসুপ্ত, তারপর অপ্রতিরোধ্য শক্তিসম্পন্ন অন্ধকারনাশক ভগবান স্বয়ংভূ স্বয়ং অব্যক্ত থেকে পঞ্চমহাভূতাদি সকল পদার্থকে ব্যক্ত করলেন। ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম, সনাতন, সর্বভূতময়, অচিন্ত্যনীয় তিনি নিজেই উদ্ভূত হলেন। তিনি নিজের শরীর থেকে বিবিধ জীব সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে ভেবে ভেবে প্রথমে জল সৃষ্টি করে তাতে তাঁর বীজ আরোপিত করলেন। সেই বীজ সূর্যতুল্য প্রভাবিশিষ্ট স্বর্ণডিম্বে পরিণত হলো। তাতে

সমগ্র জগতের পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রথম বাস ছিল জলে, জলকে যেহেতু নারা বলে অভিহিত করা হত সেইহেতু তাঁকে বলা হত নারায়ণ (নারা+অয়ন বা আশ্রয়)। সেই-ই প্রথম কারণ, যা অব্যক্ত এবং যা সৎও বটে, অসৎও বটে। তার থেকে উদ্ভূত পুরুষকেই লোকে ব্রহ্মা বলে। সেই অণ্ড বা ডিম্বে ভগবান এক বছর বসবাস করে তাকে দ্বিধাবিভক্ত করলেন, সেই দুই ভাগ থেকে তিনি সৃষ্টি করলেন স্বর্গ এবং মর্ত্য।

২)

মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ে বত্রিশতম থেকে একচল্লিশতম শ্লোকে মনু বলছেন, ব্রহ্মা স্বদেহকে দ্বিধা বিভক্ত করলেন –একভাগ হল পুরুষ, অপরভাগ নারী। সেই নারীর থেকে তিনি সৃষ্টি করলেন বিরাজ্। এই বিরাজ্ তপস্যা করণান্তর একটি পুরুষ সৃষ্টি করলেন; এই পুরুষই "মনুসংহিতা"-র প্রবক্তা মনু। জীবসিসৃক্ষু মনু প্রথমে সৃষ্টি করলেন প্রজাপতি স্বরূপ দশজন মহামুনিকে। তাঁরা সৃষ্টি করলেন সপ্তমনু, বিভিন্নশ্রেণির দেবগণ, মহান ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সর্প, বিহঙ্গ, বিভিন্ন শ্রেণির পিতৃগণ, বিদ্যুৎ, মেঘ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ নক্ষত্ররাজি, বানর, মৎস্য, গোমহিষাদি, হরিণ, মানুষ, কীট, মক্ষিকা ও স্থাবর বৃক্ষাদি।

৩)

মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ে চুয়াত্তরতম থেকে আটাত্তরতম শ্লোকে মনু বলছেন, সুপ্তোত্থিত ব্রহ্মা তাঁর মন সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মার সিসৃক্ষার প্রেরণায় উদ্ভূত হল শব্দগুণ আকাশ, আকাশের বিকৃতি থেকে সৃষ্ট হল স্পর্শগুণ বায়ু, বায়ু থেকে উদ্ভব দীপ্তিময় আলোকের, যার থেকে প্রাদুর্ভাব হল জলের, জল থেকে উৎপত্তি হল গন্ধযুক্ত ক্ষিতি বা মাটির'।

(এখানেও পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মুহাম্মদ যে নবি ছিলেন না কোরানই তার প্রমাণ, মনু যে ভগবান ছিলেন না মনুস্মৃতিই তার প্রমাণ)

পাঠকদের বুঝার জন্যে শুধু বলে রাখি মুসলমানদের কোরান থেকে শরিয়া আইনের সৃষ্টি আর হিন্দুদের বেদ থেকে মনুস্মৃতি একই আকারের একই উদ্যেশ্যে রচিত। ইসলামের ইতিহাস ও খলিফাদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র নিয়ে যারা অবগত আছেন তারা হিন্দু ধর্মগ্রন্থের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও অনুক্রম বা পরম্পরা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। খলিফারা যেমন তাদের সকল ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সকল আইনকে আল্লাহর আইন ও তাদের নিজেদেরকে আল্লাহর মনোনীত শাসক বলে প্রচার করতেন, হিন্দুদের ব্রাহ্মণরাও একইভাবে একই উদ্দেশ্যে তাদের সকল আইনকে ব্রহ্মার আইন বা ঐশ্বরিক মতবাদ ও নিজেদেরকে ব্রহ্মার প্রতিনিধি বা মনোনিত শাসক বা রাজা বলে প্রচার করতেন।

অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো লিখেন,
"প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক মতবাদ বহুল প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে সেন্ট অগাস্টাইন, সেন্ট পল, সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাসের লেখনীতে এই মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ১৬৮৮ সালের ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবের পর থেকে এই মতবাদের গুরুত্ব হ্রাস পেতে শুরু করে। ঐশ্বরিক মতবাদের মূল বক্তব্য ছিল-
(১) রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টির পিছনে মানুষের কোনো ভূমিকা নেই।
(২) রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা রাজার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। সেই জন্য রাজার আদেশ বা নির্দেশ, যা আইনরূপে গণ্য হয়ে থাকে, তা মান্য করা সকল মানুষের একান্ত কর্তব্য। রাজার আইন মান্য না-করার অর্থ হল ঈশ্বরকে অবমাননা করা।
(৩) ঈশ্বরের বিধান অনুসারে রাজপদ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যায়। রাজার মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হবেন।
(৪) রাজা যেহেতু ঈশ্বরের প্রতিনিধি সেহেতু তিনি কখনোই অন্যায় করতে পারেন না। ঈশ্বর ছাড়া তিনি আর কারও কাছে তাঁর কাজের জন্য জবাব দিতে বাধ্য নন।

(৫) ঈশ্বরের প্রতিনিধি এই রাজার বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ করা যায় না। এই ধারণা বা তত্ত্ব শুধু ভারতবর্ষের হিন্দুধর্মেই নয়, এই তত্ত্ব মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি ইত্যাদি সব ধর্মেই প্রচার করা হয়েছে।"

মনু ও তার মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা নিয়ে লেখক রণদীপম বসু 'মনু'র বৈদিক চোখ: নারীরা মানুষ নয় আদৌ' শিরোনামে 'মুক্তমনা' ব্লগে একটি ধারাবাহিকে 'মনুসংহিতার উন্মেষ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ' অধ্যায়ে লিখেছেন,

"বেদ (Veda) ও উপনিষদের পরে ভারতবর্ষে ছয়টি আস্তিক দর্শনের আবির্ভাব ও পর্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে এগুলোর ক্রমবিকাশ ঘটে। অর্থাৎ বেদের সংহিতাকে আশ্রয় করে পরবর্তীতে পর্যাক্রমে রচিত অন্য সাহিত্য বা স্মৃতিগ্রন্থগুলো যেমন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক হয়ে উপনিষদের যুগে এসে পুরোপুরি ভাববাদে প্রবেশ করেছে। ততদিনে ভারতীয় সমাজে হিন্দুইজম (Hinduism) বা বৈদিক দর্শন রীতিমতো শেকড় গেড়ে বসেছে। এবং সেগুলোকে আশ্রয় করে পরবর্তীকালে রচিত বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের মাধ্যমে ধর্মীয় শাসনতন্ত্র তার শেকড়-বাকড় ছড়িয়ে সমাজদেহে পূর্ণ থাবা বিস্তার করে ফেলেছে। তারই ঐতিহাসিক উৎকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে মনুস্মৃতি (Manu smriti) বা মনুসংহিতা (Manu samhita), যাকে বৈদিক সংস্কৃতি বা ব্রাহ্মণ শাসনের সংবিধান বললেও বাহুল্য হবে না। সামাজিক বিশ্বাস এমন যে, এর মধ্যেই নিহিত আছে সমস্ত বেদার্থ। অথচ এই মনুসংহিতাই হলো পৃথিবীর অন্যতম বর্বর, নীতিহীন, শঠতা আর অমানবিক প্রতারণায় পরিপূণ বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদের আকর গ্রন্থ। ভারতীয় শ্রুতি ও স্মৃতির পরম্পরায় বৈদিক পরিমণ্ডলের ধর্মীয় দুরুহতা অতিক্রমের জন্যেই উপনিষদগুলোর পরবর্তী ধাপে মনুসংহিতার মতো ধর্মশাস্ত্র সৃষ্ট হয় বলে দাবি করা হয়। এটিকে বেদের নির্যাস স্মৃতিগ্রন্থ হিসেবে দাবি করা হলেও মূলতঃ তা উপরিউক্ত সবগুলো গ্রন্থেরই নির্যাস নিয়ে রচিত ব্রাহ্মণ্য শাসনতন্ত্রের নীতিসূত্রগ্রন্থ বলে মনে করা হয়। তার আলোকেই হিন্দু ধর্মের যাবতীয় রীতিনীতি জীবনযাপন পূজাশাসন আচারবিচার সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং এখনো তার ভিত্তিতেই ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড বাস্তবায়ন করা

হয়ে থাকে। এমন কি বর্তমানেও হিন্দু ধর্মানুসারীদের জন্য প্রয়োগযোগ্য রাষ্ট্রীয় যে বিশেষ আইন যেখানে 'হিন্দু আইন অনুযায়ী' শব্দ-সমষ্টি দ্বারা ট্যাগ করা হয়ে থাকে তার অন্যতম উৎস হিসেবেও মনুসংহিতাই প্রধান। অর্থাৎ এটি সমাজ-উদ্ভূত বিশেষ আইনশাস্ত্র হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অথচ মজার ব্যাপার হলো, চা থেকে যেমন পেয়ালা গরম হয়ে থাকে তেমনি বেদের সহনীয় নিরপেক্ষতার চাইতেও কথিত বেদাশ্রিত মনুসংহিতার আরোপিত অনুশাসনগুলো শতগুণ কট্টর বর্ণবাদী, বৈষম্যমূলক ও তীব্র অমানবিকই শুধু নয়, অদ্ভুত বর্ণাশ্রম প্রচলনকারী এই শাস্ত্রগ্রন্থে বস্তুত মানবিক সত্তাময় মানুষের উপস্থিতি নাই বললেই চলে। আর নারী তো সেখানে মানুষই নয়, হয়তো অন্যকিছু"। (রণদীপম বসু- 'মুক্তমনা' ব্লগ, 'মনু'র বৈদিক চোখ: নারীরা মানুষ নয় আদৌ')

কী লিখেছেন কী বলেছেন মনু নারীদের নিয়ে তার মনুসংহিতায়? এবার আমরা 'যে সত্য বলা হয়নি' বইয়ের 'দুই 'ম' এর নারী শিক্ষা' অধ্যায় থেকে নারীর প্রতি মনুর দৃষ্টিভঙ্গী কেমন ছিল তা জেনে নিব। সেই মানবধর্মশাস্ত্রে 'নারী' সম্বন্ধে ভগবান মনু বলেন,-
-নবম অধ্যায়, চৌদ্দ নম্বর শ্লোক; সংক্ষেপে ৯:১৪):

"নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ
সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে"।

অর্থাৎ, স্ত্রীরা রূপ বিচার করে না, (যৌবনাদি) বয়সে এদের আদর নেই, রূপবান বা কুরূপ পুরুষ মাত্রেই সম্ভোগ করিতে চায়। (উল্টো হয়ে গেলোনা? আমরা তো উপরে বহুবার দেখলাম এ অভাবনীয় দুশ্চরিত্র বা অভ্যেসটা পুরুষ ব্রাহ্মণদেরই)।
মনু বলেন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে (৫:১৫৪):

"বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জিতঃ।

উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ"।

অর্থাৎ, পতি দুশ্চরিত্র, কামুক বা গুণহীন হলেও তিনি সাধ্বী স্ত্রীকর্তৃক সর্বদা দেবতার ন্যায় সেব্য। (বাহ, তাহলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে স্বামী দুশ্চরিত্র, কামুক বা গুণহীন মূর্খ বোকা হতেই পারে?)

"স্ত্রী স্বামীকে অবহেলা করে ব্যভিচারিণী হলে সংসারে নিন্দনীয় হয়, শৃগালের জন্মপ্রাপ্ত হয় এবং (যক্ষ্মা কুষ্ঠাদি) পাপরোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়"। (৫/১৬৪)।

স্ত্রীর আগে স্বামী মারা গেলে মনু স্পষ্ট ঘোষণা দেন (৫/১৫৭):
"স্ত্রী বরং পবিত্র ফল, মূল, ফুল খেয়ে দেহ ক্ষয় করবেন, তথাপি পতি মৃত হলে অন্যের নামোচ্চারণ করবেন না।"
কিন্তু স্বামীর আগে স্ত্রী মারা গেলে মনুর নিয়মটি ঠিক উল্টো (৫/১৬৮-১৬৯): "পূর্বে মৃত স্ত্রীকে অন্ত্যেষ্টিক্রীয়ায় আগুন দিয়ে (স্বামী) পুনরায় বিবাহ করবেন; বিবাহ করে আয়ুর দ্বিতীয়ভাগ গৃহে বাস করবেন।"

আবার স্কন্ধপুরাণের নাগরখণ্ডের ৬০ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে:

"নির্দয়ত্বং, তথা-দ্রোহং কুটিলত্বং বিশষতঃ
অশৌচং নির্ঘৃণতৃঞ্চস্ত্রীনাং দোষা স্বভাবজাঃ"।

অর্থাৎ, নির্দয়ত্ব, দ্রোহ, কুটিলতা, অশৌচ ও নির্ঘৃণত্ব এই সমস্ত দোষ নারী জাতির স্বভাবজাত।
স্কন্ধপুরাণের এই শ্লোকের সাথে মিল রয়েছে মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২১৩ নং শ্লোকের; সেখানে মনু বলেন,

"স্বভাব এস নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্
অতোহর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ।"

অর্থাৎ, নারীদের স্বভাবই হল পুরুষদের দূষিত করা...।

“নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রীয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্থিয়োহনৃতমিতি স্থিতিঃ”। (৯:১৮):

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণসহ সকল সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য বেদ-স্মৃতি পাঠ, মন্ত্র উচ্চারণ,পূজা-অর্চনা প্রভৃতিতে কোনো অধিকার নেই। নারীরা মন্ত্রহীন, মিথ্যার ন্যায় অশুভ।

আবার মনু বলেন (৯:১৫):

"পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈঃহ্যোচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোহপীহ ভর্ত্তৃস্বেতা বিকুর্বতে"।

অর্থাৎ- পুরুষ দর্শনমাত্র স্ত্রীদের পুরুষের সাথে সঙ্গম করার ইচ্ছা জাগে এবং চিত্তের স্থিরতার অভাবে স্বভাবত স্নেহশূন্যতা প্রযুক্ত স্বামী কর্তৃক রক্ষিতা হলেও স্ত্রীলোক ব্যভিচার প্রভৃতি কুক্রিয়া করে।

মনুর এই স্বর্গীয় বাণী স্ত্রী, মা, বোন সকলের প্রতি প্রযোজ্য। পদ্মপুরাণে আরও উল্লেখ পাই (সৃষ্টিখণ্ড, ৯১ নম্বর শ্লোক)

“দাসীং হাত্যাতু লিঙ্গস্য নরকান্ন নিবর্ত্ততে-কামার্তে
মাতরং গচ্ছেন গচ্ছেচ্ছিব চেটিকাম।”

অর্থাৎ, শিবলিঙ্গ সেবিকা দাসী হরণ করলে চিরকাল নরক ভোগ হয়ে থাকে। কামার্ত হয়ে বরং মাতৃগমন করবে তথাপি শিবলিঙ্গ সেবিকা গমন করবে না।

“কামার্ত হয়ে মাতৃগমন” এর মা’নেটা কী?

"অন্তবিষঃ ময়া-হোতা...বহির্ভাগে মনোরমাঃ।

গুঞ্জাফল সমাকারা ঘোষিতঃ সর্বদৈবহি"।

- স্কন্ধপুরাণ নাগরখণ্ড শ্লোক নং ৬১।

অর্থাৎ নারী জাতি সর্বদাই গুঞ্জাফলের ন্যায় বাইরে মনোহর। নারীর অধরে পীযুষ আর হৃদয়ে হলাহল, এ জন্যই তাদের অধর (ঠোঁট) আস্বাদন এবং হৃদয়ে পীড়ন (প্রহার) করা কর্তব্য।

নারীর শুধু হৃদয়ে পীড়ন করাই নয়, শতপথ ব্রাহ্মণের ৪/৪/২/১৩ নং শ্লোকে: নারীকে শারীরিক নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে।

"বজ্র বা লাঠি দিয়ে মেরে নারীকে দুর্বল করা উচিৎ, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির উপর কোনো অধিকার থাকতে না পারে"।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবাল্ক্য বলেন: "স্ত্রী স্বামীর সম্ভোগকামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হলে প্রথমে উপহার দিয়ে স্বামী তাকে 'কেনবার' চেষ্টা করবে, তাতেও অসম্মত

হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে নিজের বশে আনবে।" (দ্রষ্টব্য: ৬/৪/৭, ১/৯/২/১৪)।
মনুসংহিতাতে মনু ঘোষণা দেন (৯:৩):

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"।

অর্থাৎ স্ত্রীলোককে কুমারী জীবনে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করে; স্ত্রীলোক (কখনও) স্বাধীনতার যোগ্য নয়।
আবার একটু পরেই বলা হয়েছে (৯:৮৮):

"উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ/
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি।"

অর্থাৎ কুলে আচারে উৎকৃষ্ট, স্বজাতি ও স্বরূপী বর পাইলে কন্যা বিবাহযোগ্য না হলেও তাকে যথা-বিধানে সম্প্রদান করিবে। (হিন্দু ধর্মে মনু বাল্য বিবাহ জায়েজ করে দিয়েছেন।)

'সম্প্রদান' মানে কী? মানে হচ্ছে বস্তু বা মালের মালিকানা বা স্বত্বাধিকার বদল। নারী প্রথমে তার পিতার মাল এবং বিয়ের পরে তার স্বামীর মাল। বিবাহিত নারীর ওপর তার স্বামীর আজীবন মালিকানা থাকে। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পরেও সে তার মৃত স্বামীর সম্পদ থেকে যায়। নারী যে মাল বা জিনিস বা সম্পদ তা আমরা আগেই জেনেছি পঞ্চপান্ডবের কাছ থেকে। তারা দৌপদীকে ঘরে নিয়ে এসে তাদের মাকে বলেছিলেন 'দেখো মা কি জিনিস নিয়ে এসেছি। বাল্যবিবাহ বিধিসম্মত কিন্তু বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিবাহ হিন্দু-শাস্ত্রমতে মহাপাপ।

মনুর দৃষ্টিতে নারী ছিল গাভীর মতো। মনু বলেন (৯:৫০):

“যেমন গবাদি গর্ভে উৎপন্ন বৎস গো-স্বামীর (গাভীর স্বামী) হয়, তেমন পর পুরুষে উৎপাদিত সন্তান উৎপাদকের হয়না, ক্ষেত্রীরই হয়।”

পরবর্তী শ্লোকে মনু বলেন:

“তথৈবাক্ষেত্রিণো বীজং পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ
কুর্ব্বন্তি ক্ষেত্রিণামর্থং ন বীজী লভতে ফলম্”।

অর্থাৎ, যদি কোনো স্ত্রীর স্বামী পরস্ত্রীতে বীজ বপন করে ঐ স্ত্রীর পতির অর্থ সৃষ্টি করে; যার বীজ সে ফল লাভ করে না, কারণটা পরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক (৫২ নং) তে বলা হয়েছে:

“ফলন্ত্বনভিসন্ধায় ক্ষেত্রিণাং বীজিনাং তথা
প্রত্যক্ষং ক্ষেত্রিণামর্থো বীজাদ্ যোনির্গরীয়সী”।

অর্থাৎ, নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে এই স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান ক্ষেত্রী ও বীজ উভয়ের হবে বলে অভিসন্ধি না থাকলে উৎপাদিত সন্তান প্রত্যক্ষরূপে ক্ষেত্রীরই হবে, কারণ বীজ অপেক্ষা যোনিই প্রধান। ‘বীজ অপেক্ষা যোনিই প্রধান’ কথাটার দ্বারাই বুঝা যায় মনুর দৃষ্টিতে নারীর মুল্যায়ণ।

‘নিয়োগ প্রথা’ কী? ‘নিয়োগ প্রথায়’ স্বামীর মৃত্যুর পর বিবাহ ছাড়া দেবর অথবা অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করানো মনুসংহিতাসহ হিন্দু ধর্মের আরেক ধর্মগ্রন্থ মহাভারত অনুযায়ী বৈধ। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে (৯:৫৯):

“দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রীয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া
প্রজেস্পিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে।”

অর্থাৎ, সন্তানের অভাবে স্ত্রী, পতি বা গুরুজন কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া দেবর অথবা অন্য যেকোনো সপিণ্ড হইতে অভিলাষিত সন্তান লাভ করিবে। এর একটি উদাহরণ আছে কাশিরাম দাস কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারতের আদিপর্বে:

“শান্তনু রাজার পুত্র বিচিত্রবীর্য যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। ফলে তার মাতা মৎস্যগন্ধা (পরবর্তীকালে সত্যবতী) বংশরক্ষার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তিনি স্বপত্নী গঙ্গার পুত্র ভীষ্মদেবকে আহ্বান করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা স্ত্রী যথাক্রমে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্রোৎপাদনের প্রস্তাব করেন। ভীষ্মদেব ইতিপূর্বে কোনো কারণে জীবনে বিবাহ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তাই পুত্রোৎপাদনে ভীষ্মদেব অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অনন্যোপায় হয়ে সত্যবতী অবিবাহিত অবস্থায় পরাশর মুণির ঔরসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (আরেক নাম বেদব্যাস) নামে যে তার (জারজ?) সন্তান হয়েছিল তাকে আহ্বান করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মায়ের আদেশ পালনার্থে তাতে সম্মতি জানান এবং তার দুই ভ্রাতৃবধু ও তাদের দাসীর গর্ভে একটি একটি করে মোট তিনটি পুত্রের অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্ম দান করেন'।

অন্যত্র মনু ভ্রাতৃবধূকে দেবরের মা এবং দেবরকে ভ্রাতৃবধূর ছেলে হিসেবে সম্মান দেখাতে বলেছেন। ভাইয়ের মৃত্যুর পর কিংবা ভাইয়ের সন্তান না থাকলে ভাতৃবধুর সাথে পুত্রোৎপাদনের জন্য সঙ্গম করার কথাও বলা হয়েছে। (৯:৫৯)।

মনুর ভাষ্যানুযায়ী তাহলে তো পরোক্ষভাবে মায়ের সাথেই সঙ্গম করা। আর এ কাজটি চলতে থাকবে, পুত্রোৎপাদনে যতদিন সময় লাগে ততদিন পর্যন্ত। মনু বলছেন (৯:৫৭):

“ভ্রাতুর্জ্যষ্ঠেস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ম্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু ভার্য্যা যাষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা”।

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতার স্ত্রী হলো, কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরুপত্নী অর্থাৎ মাতৃতুল্য, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধূতুল্য'।

এবার পুত্রোৎপাদনের জন্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গম হবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মাতৃতুল্য বিধবার সঙ্গে আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গম হবে পুত্রবধূতুল্য কনিষ্ঠ ভ্রতার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে। বিষয়টি উল্টোভাবেও করা যায় যেমন, একজন সন্তানহীন বিধবা পুত্রোৎপাদনের জন্যে তার পুত্রতুল্য দেবরের সাথে এবং একজন সন্তানহীন বিধবা পিতৃতুল্য তার স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাথে সঙ্গমের প্রস্তাব করতে পারবেন। এ বিশেষ সঙ্গমটি কীভাবে হবে তাও ভগবান মনু বলে দিয়েছেন (৯:৬০):

"বিধবায়াং নিযুক্তস্তত্ ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন।"

অর্থাৎ বিধবাতে নিযুক্ত হইয়া ঘৃতাক্ত-শরীরে, মৌনতা অবলম্বন করতঃ, রাত্রিবেলা, একটিমাত্র পুত্রোৎপাদন করিবে। কদাচ দ্বিতীয় পুত্রোৎপাদন করিবে না।

গভীর অন্ধকারে পুত্রোৎপাদন করার জন্যে নিশিথ রাতের অর্থ বুঝা গেল, কিন্তু নারীকে মৌনতা অবলম্বন আর তার শরীরকে ঘৃতাক্ত করার মা'নেটা কী? মা'নে হতে পারে, নিঃসংকোচে যৌনকার্য চালিয়ে নিখুত সন্তান লাভ করা। তাইতো মহাভারতে আমরা দেখতে পাই:

"বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্রোৎপাদনের জন্যে যখন মহাপুরুষ বেদব্যাসকে নিয়োগ করা হয় তখন অম্বিকা ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করেছিল এবং অম্বালিকার অন্তর ভীত-সন্ত্রস্থ হয়েছিল। ফলে অম্বিকার গর্ভে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের এবং অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুরোগগ্রস্ত পাণ্ডুর জন্ম হয়। নবজাত পুত্রদ্বয়ের এই অবস্থা দেখে সত্যবতী খুবই দুঃখ পেলেন। তিনি পুত্র বেদব্যাসকে অম্বিকা অথবা অম্বালিকার গর্ভে গন্ধর্বের মতো সুন্দর পুত্রোৎপাদনের জন্যে অনুরুধ করেন। কিন্তু অম্বিকা ও অম্বালিকা

উভয়েই তাতে অসম্মতি জানান এবং উভয়ে পরামর্শ করে নিজেদের জনৈক শূদ্রাণীকে (দাসী) রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিতা করতঃ অম্বিকার বিছানায় শয়ন করান। যেহেতু বেদব্যাসের সাথে সঙ্গমের সময় এই দাসীর মনে কোনো দ্বিধাসংকোচ বা ভয় ছিল না অতএব তার গর্ভে এক সুন্দর পুত্রের জন্ম হয়। যার নাম রাখা হয় 'বিদুর'।"

এখানে রাতের পর রাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে রতিক্রিয়ার পরেও সে হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 'পুত্রবধূ', আর ওদিকে নবি মুহাম্মদ তার পালক পুত্র জায়েদ জীবিত থাকাকালেই 'আল্লাহর অনুমতি' নিয়ে এসে পুত্রবধূ জয়নাবকে বিয়ে করে তার সাথে আজীবন রতিক্রিয়া করেন। (সুরা ৩৩, আহজাব, আয়াত ৩৭ দ্রষ্টব্য)। অবশ্য নবি মুহাম্মদের পরে তাঁর কোনো উম্মত অদ্যাবধি এই ধরনের কাজ করেছেন বলে কখনো জানা যায়নি।

সুহৃদয় ভগবান মনু বিধবা নারীদের দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন একটি শর্তে। শর্তটি হলো স্বামীর মৃত্যুকালে যদি তার (নারীর) যোনি অক্ষত থাকে। (৯:১৭৬) কীভাবে সম্ভব? সম্ভব এভাবেই যদি ঐ নারীর কোনো নপুংসক পুরুষের সাথে বিয়ে হয়, অথবা বাগদত্তা কন্যার পতি মৃত হয়, কিংবা বিয়ের সাথে-সাথেই স্বামী মারা যায়, বা মৃত ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয়। মৃত ব্যক্তির সাথে বিয়ে! হায় ধর্ম, কিন্তু বিধি বাম। বিধবাদের এই সুখটুকুও পরাশর মুনির সইলো না। নিয়োগপ্রথা বা দেবরাদির দ্বারা

সন্তানোৎপাদনের কাজ যতোই ঘৃণ্য, অশ্লীল এবং ন্যাক্কারজনক হোক না কেন, তা চালু থাকায় হতভাগিনী বিধবাদের স্বাভাবিক শারীরিক যৌন চাহিদা নিবারণের কাজ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মহামুনি পরাশর সেটাও সহ্য করতে পারলেন না, তিনি তাঁর আইনে (পরাশর সংহিতা) ঘোষণা দিলেন, 'অশ্বমেধ, গোমেধ যজ্ঞ, সনড়বাস অবলম্বন, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন এই পাঁচটি কলিকালে বর্জন করতে হবে'।

নারীকে ভোগের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য পরিষ্কার। 'পুরুষ যখন যেভাবে চাইবে নারীকে ভোগ করবে।' সঙ্গমাসন কেমন হবে তাও নির্ধারণ করবে পুরুষ এখানে নারীর পছন্দ অমার্জনীয় পাপ। পুরুষের লিঙ্গ জীবন্ত-সক্রিয় বীজ আর নারীর যোনি প্রাণহীন আবাদভূমি। চাষী তার জমিতে চাষ করবে তার ইচ্ছেমত যখন-তখন। নারীর যোনি যে পুরুষের চাষক্ষেত্র, এ ব্যাপারে ভগবান মনুর সাথে নবি মুহাম্মদের মতের মিল আছে, কোরানেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মনুর চোখে নারী জাতি পুরুষের উপভোগ্য 'সম্পদ' বৈ কিছু নয় এবং নারীগণ কেবলই মিথ্যা পদার্থ।

কেবলমাত্র মনুসংহিতার ৯ম অধ্যায়ই নয়, এই ধর্মের প্রতিটি গ্রন্থের পাতায়-পাতায় রয়েছে নারী অপমানের সাক্ষী। বিভিন্ন কুৎসিত বিশেষণে তারা আখ্যায়িত করেছেন নারীকে।

মনুসংহিতা পর্ব শেষ করার আগে প্রয়াত মুক্তমনা লেখক অনন্ত বিজয় দাশের 'সনাতন ধর্মে'র দৃষ্টিতে নারী' শিরোনামের লেখাটির ওপর কিছুটা আলোচনা করতে চাই। অনন্ত বিজয় দাশ লিখেছেন,

"সনাতন হিন্দু ধর্মের তথাকথিত প্রগতিশীল লোকেরা সময়-সুযোগ পেলেই বড়াই করে বলে বেড়ান, হিন্দু ধর্মে নাকি নারীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা-সম্মান দেয়া হয়েছে নারীদের

মাতৃজ্ঞানে এ ধর্মে পূজা করা হয়; হিন্দু নারীরা অন্যান্য ধর্মের তুলনায় অনেক বেশি প্রগতিশীল! এ ধরনের বক্তব্য প্রচারের কারণ আছে; পশ্চিমা সামাজ্যবাদের বর্তমান চক্ষুশুল ইসলামি মৌলবাদ নিয়ে সারাবিশ্বের গণমাধ্যমগুলো ব্যস্ত থাকায় ফাঁক দিয়ে সুযোগ বুঝে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের ধর্মকে প্রগতিশীল, যুগোপযোগী, নারী স্বাধীনতার পক্ষে- ইত্যাদি তকমা ব্যবহার করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন"।

অনন্ত বিজয় দাশ লেখাটি লিখেছিলেন ২০১০ সালে, তখনই বুঝতে পেরেছিলেন মডারেট হিন্দুদের দুরভিসন্ধি। তারা নিজের ধর্মগ্রন্থের দিকে চেয়ে দেখেন না, অথচ অন্যের ধর্মের সরা শরিয়ত, রীতি-নীতি, বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন সব তাদের নখদর্পনে।

কোরানের কোন্ আয়াত নারীকে প্রহার করতে বলেছে, হাদিসের কোন্ বিধানে ধর্ষণের কী শাস্তি আর জেনার কী শাস্তি সব তাদের মুখস্ত। কিন্তু নিজেদের কিতাবগুলোর দিকে একবারও তারা তাকিয়ে দেখলেন না। তাকালে নিশ্চয়ই দেখতে পেতেন তাদের ধর্মগ্রন্থের বিধি-বিধানসমুহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোর চেয়েও অনেকক্ষেত্রে বেশি আমানবিক। অনন্ত বিজয় দাশ লিখেছেন,

"শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে নারীকে তুলনা করা হয়েছে এভাবে, 'সে ব্যক্তিই ভাগ্যবান, যার পশুসংখ্যা স্ত্রীর সংখ্যার চেয়ে বেশি" (২/৩/২/৮)। শতপথ ব্রাহ্মণের এ বক্তব্যকে হয়তো দরদী ধর্মবাদীরা ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে যৌক্তিকতা দিতে চেষ্টা করবেন, কিন্তু পরের আরেকটি শ্লোকে পাওয়া যায় হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান; "বজ্র বা লাঠি দিয়ে নারীকে দুর্বল করা উচিৎ, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির উপর কোনো অধিকার না থাকতে পারে" (৪/৪/২/১৩)। এর থেকে স্পষ্ট কোনো বক্তব্যের আর প্রয়োজন আছে? বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবাল্ক্য বলেন, স্ত্রী স্বামীর সম্ভোগকামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হলে প্রথমে উপহার দিয়ে স্বামী তাকে 'কেনবার' চেষ্টা করবে, তাতেও অসম্মত হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে

নিজের বশে আনবে” (৬/৪/৭, ১/৯/২/১৪)। দেবীভাগবত-এ নারীর চরিত্র সম্পর্কে বলা আছে (৯:১): “নারীরা জোঁকের মত, সতত পুরুষের রক্তপান করে থাকে। মুর্খ পুরুষ তা বুঝতে পারে না, কেননা তারা নারীর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। পুরুষ যাকে পত্নী মনে করে, সেই পত্নী সুখসম্ভোগ দিয়ে বীর্য এবং কুটিল প্রেমালাপে ধন ও মন সবই হরণ করে।” বাহ্! হিন্দুরা নাকি মাতৃজ্ঞানে দেবীর (দূর্গা, কালি, মনসা, স্বরসতী, লক্ষী) পূজা করে? ‘নারী’ সম্পর্কে যাদের ধর্মীয় বিধানে এমন হীন বক্তব্য রয়েছে, তারা দেবীর পূজা করলেই কী আর না-করলেই কী?”

বৃহদারণ্যকোপনিষদের (৬/৪/৭) এ বাক্যটি হুবহু কোরানের ৪নং সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াত হয়ে গেলোনা? স্ত্রীকে প্রহার করার আয়াত নিয়ে দুনিয়া তোলপাড় করার আগে নিজের ধর্মে কী লেখা আছে তা জানবেন না? ‘পত্নী সুখসম্ভোগ দিয়ে বীর্য এবং কুটিল প্রেমালাপে ধন ও মন সবই হরণ করে’ এমন আশ্লীল বাক্যও কোনো ধর্মগ্রন্থে থাকতে পারে? অনন্ত বিজয় দাশ তার প্রবন্ধে আরও লিখেন,

“হিন্দু আইনের মূল উৎস হচ্ছে এই ‘মনুসংহিতা’ এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছেও এটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিবেচ্য। এই ধর্মগ্রন্থে নারীর কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, “বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ/পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোহগ্নিপরিক্রিয়া॥” (২:৬৭), অর্থাৎ ’স্ত্রীলোকদের বিবাহবিধি বৈদিক সংস্কার বলে কথিত, পতিসেবা গুরুগৃহেবাস এবং গৃহকর্ম তাদের (হোমরূপ) অগ্নিপরিচর্যা; আবারও বলে দেয়া হয়েছে নারীর কর্তব্য’ গৃহকর্ম এবং সন্তান উৎপাদন (৯:২৬)। সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্যই নারী এবং সন্তান উৎপাদনার্থে পুরুষ সৃষ্টি হয়েছে (৯:৯৬)। যে সকল নারী একদা বৈদিক মন্ত্র-শ্লোক পর্যন্ত রচনা করেছিলেন, তাদের উত্তরসূরীদের জন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত-অমন্ত্রক (২:৬৬); নারী মন্ত্রহীন, অশুভ (৯:১৮)। কন্যা, যুবতী, রোগাদি পীড়িত ব্যক্তির হোম নিষিদ্ধ এবং করলে নরকে পতিত হয় (১১:৩৭)! স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে (৫:১৫৪) “বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জিতঃ/উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥” বাংলা করলে দাঁড়ায়, স্বামী

দুশ্চরিত্র, কামুক বা নির্গুণ হলেও তিনি সাধ্বী স্ত্রী কর্তৃক সর্বদা দেবতার ন্যায় সেব্য। পরবর্তী শ্লোকে রয়েছে, কোনো নারী (স্ত্রী) যদি স্বামীকে অবহেলা করে, ব্যভিচারিণী হলে সংসারে তো নিন্দিত হবেই সাথে-সাথে যক্ষা, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়, শুধু তাই নয় পরজন্মে শৃগালের গর্ভে জন্ম নিবে সেই নারী (৫:১৬৩-১৬৪)। স্ত্রীদের জন্য স্বামী ছাড়া পৃথক যজ্ঞ নেই, স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো ব্রত বা উপবাস নেই, শুধু স্বামীর সেবার মাধ্যমেই নারী স্বর্গে যাবে (৫:১৫৫)। সাধ্বী নারী কখনো জীবিত অথবা মৃত স্বামীর অপ্রিয় কিছু করবেন না (৫:১৫৬)।

এ যেন কোনো মুফতির লেখা 'স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য' কিংবা 'মোকছেদুল মুমেনিন' বা 'বেহেস্তের কুঞ্জি' জাতীয় কোনো ইসলামিক বই পড়া হলো। একই কথা একই দৃষ্টিভঙ্গী।

নারীর কোনোই গুণ নেই সকল গুণের অধিকারী একমাত্র পুরুষ, তবে শুধু ব্রাহ্মণ পুরুষ।

অনন্ত বিজয় দাশ পরবর্তীতে লিখেন,

"নারীর গুণাবলী নিয়ে মনু বলেন, নারীর কোনো গুণ নেই, নদী যেমন সমুদ্রের সাথে মিশে লবণাক্ত (সমুদ্রের গুণপ্রাপ্ত) হয়, তেমনই নারী বিয়ের পর স্বামীর গুণযুক্ত হন (৯:২২)। নারীর স্বাধীনতা সম্পর্কে মনুর সংহিতাতে বলা আছে: "অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দ্দিবানিশম্/বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে॥" (৯:২), অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের স্বামীসহ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দিনরাত পরাধীন রাখবেন, নিজের বশে রাখবেন...; নারী সম্পর্কে ঘৃণ্য দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে আছে সমগ্র মনুসংহিতা জুড়েই; নারীনিন্দায় মনুসংহিতা শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। মনুর দৃষ্টিতে নারী স্বভাব ব্যভিচারিণী, কামপরায়ণা; কাম, ক্রোধ, পরহিংসা, কুটিলতা ইত্যাদি যত খারাপ দোষ আছে, সবই নারীর বৈশিষ্ট্য এসব দিয়েই নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে! তবু সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এসব কিছুই নজরে আসে না, তাঁরা উদয়-অস্ত খুঁজে বেড়ান ইসলামধর্ম, খ্রিস্টানধর্ম, বৌদ্ধধর্ম নারীদের কোন্ অধিকার দিয়েছে, আর কোন্ অধিকার দেয়নি!

আলোচনায় মশগুল কোথায় কোন মুসলিম দেশে নারীদেরকে পাথর ছুঁড়ে হত্যার ফতোয়া দেয়া হল, বোরকা চাপিয়ে দেয়া হল, কিংবা কোথায় হিল্লা বিয়েতে নারীকে বাধ্য করা হল! এ নিয়েই তাদের মাথা-ব্যাথা! হিন্দুধর্মের এমন স্ববিরোধী, মানবতাবিরোধী, নারী-বিদ্বেষী চরিত্র জানার পরও কোন্ যুক্তিতে হিন্দুধর্মকে আধুনিক-প্রগতিশীল দাবি করা হয়? নারীর প্রতি এতো বিদ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা আর কোনো ধর্মে আছে কি-না আমার জানা নেই? ধর্মগুরু, ঈশ্বরতুল্য মনু ঠিক কী পরিমাণ নারী-বিদ্বেষী হলে বলতে পারেন: "নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ/সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে॥" (৯:১৪),অর্থাৎ "যৌবনকালে নারী রূপ বিচার করে না, রূপবান বা কুরূপ পুরুষ মাত্রেই তার সঙ্গে সম্ভোগ করে।"

এতোটুকু পড়ার পর পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলামধর্মের শরিয়তের মাসলা মাসায়েল ও বিধান সম্পর্কিত কিতাবাদী আর হিন্দু ধর্মের কিতাবগুলোর মধ্যে মূলত কোনোই পার্থক্য নেই। সেই নারীকে প্রহার করা, নারীকে পর্দা করা, নারীকে গৃহবন্দী করে রাখা সবই তো আছে এই গ্রন্থে। আধুনিক মুসলমান নামের একদল মুসলমানের আবির্ভাব

হয়েছে তারা হাদিসগ্রন্থ সমুহের অনুপযোগিতা, অসামঞ্জস্যতা বুঝতে পেরে কোরানকেই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ ও বিধান বলে নিজেদেরকে 'কোরান অনলি' বলে দাবি করেন। হিন্দুদের মধ্যেও একদল আধুনিক ধর্মবাদী নাজিল হয়েছেন তারা শুধু বেদকেই মানেন, মনুসংহিতা মানেন না। আর মহাভারত রামায়ণ ও গীতাকে ধর্মগ্রন্থ নয় বরং ভারতবাসীর জীবন দর্শন বা লোকগাঁথা বলে প্রচার করতে সচেষ্ট হোন। এ ব্যাপারে অনন্ত বিজয় দাশের ভাষ্য:

"হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে আরেকটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে মহাভারত; যদিও ইদানিং অনেকে একে মহাকাব্য হিসেবে বিবেচনা করেন, তবে বেশিরভাগ ধর্মাবলম্বীদের কাছে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান' বিবেচিত হয়। মহাভারতেও নারী সম্পর্কে মনুসংহিতার প্রভাব পড়েছে তীব্রভাবে, এসেছে নারী সম্পর্কে অনেক হীন বক্তব্য; যার সামান্য কয়েকটি আগ্রহীদের জন্য তুলে ধরা হচ্ছে: মহাভারতের অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হচ্ছে ভীষ্ম, তাঁর মধ্যেও স্পষ্টরূপে মনুর ছায়া পরিলক্ষিত হয়, তিনি বলেন (১৩/৩৮), 'উহাদের (স্ত্রীলোকদের) মত কামোন্মত্ত আর কেহই নাই। ... কাষ্ঠরশি যেমন অগ্নির, অসংখ্য নদীর দ্বারা যেমন সমুদ্রের ও সর্বভূত সংহার দ্বারা অন্তকের তৃপ্তি হয় না, তদ্রূপ অসংখ্য পুরুষ সংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি হয় না'। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও গুরু ভীষ্মের মতোই, তাঁর মুখেও শোনা যায় তীব্র নারীনিন্দা, 'উহারা (নারীরা) ক্রিয়া-কৌতুক দ্বারা পুরুষদিগকে বিমোহিত করে। উহাদিগের হস্তগত হইলে প্রায় কোনো পুরুষই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। গাভী যেমন নূতন নূতন তৃণভক্ষণ করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ উহারা নূতন নূতন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতে বাসনা করিয়া থাকে' (১৩/৩৯)। আবার পঞ্চপাণ্ডবের মহাজ্ঞানী পিতামহ ভীষ্মের উপলব্ধি, 'মানুষের চরিত্রে যত দোষ থাকতে পারে,সব দোষই নারী ও শূদ্রের চরিত্রে আছে। জন্মান্তরীয় পাপের ফলে জীব স্ত্রীরূপে (শূদ্ররূপেও) জন্মগ্রহণ করে' (ভীষ্মপর্ব ৩৩/৩২); 'স্ত্রীগণের প্রতি কোন কার্য বা ধর্ম নেই। (কারণ) তারা বীর্যশূণ্য, শাস্ত্রজ্ঞানহীন। (মনু, ১৩/৩৯) এরপরেও নাকি মহাভারতের কথা অমৃত সমান!

(সূত্র: মনুসংহিতা ও নারী, পৃষ্ঠা ৭২-৭৬) 'তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, দাবানল, ক্ষুরধার বিষ, সর্প ও বহ্নিকে রেখে অপরদিকে নারীকে স্থাপন করিলে ভয়ানকত্বে উভয়ে সমান-সমান হবে' (অনুশাসনপর্ব ৩৮)।"

মনু পড়লাম, মহাভারত পড়লাম নারী আর মানুষ বলে স্বীকৃতি পেলো না। পবিত্র গীতা কী বলে দেখা যাক। অনন্ত বিজয় দাশ লিখেছেন:

"ব্রাহ্মণ্যধর্মের 'সম্পূর্ণ ধর্মগ্রন্থ' রূপেই এখন গীতার স্থান; এবং কারো কারো কাছে আধুনিক ধর্মগ্রন্থ! গীতাকে বলা হয়,শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী ভগবদগীতা। কিন্তু এই গীতাতেও দেখি ভগবানের কণ্ঠে মনুর বক্তব্য! শ্রীমদ্ভগবদগীতায় পঞ্চপাণ্ডবের শ্রেষ্ঠ বীর শ্রীমান অজুর্নের মুখে শুনি- "অধর্মাভিভাবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ/স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥" (গীতা, ১:৪০) অর্থাৎ 'হে কৃষ্ণ, অধর্মের আবির্ভাব হলে কুলস্ত্রীরা ব্যভিচারিণী হয়। হে বার্ষ্ণেয়, কুলনারীগণ ব্যভিচারিণী হলে বর্ণসংকরের সৃষ্টি হয়'। এর পরেই বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি হলে কি হয়, তারও উত্তর রয়েছে: 'সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘানাং কুলস্য চ/পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ'॥ (গীতা, ১:৪১) অর্থাৎ 'বর্ণসঙ্কর, কুলনাশকারীদের এবং কুলের নরকের কারণ হয়। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়ার লোপ হওয়াতে ইহাদের পিতৃপুরুষ নরকে পতিত হয়'। এই উক্তিগুলো পঞ্চপাণ্ডবের এক ভাই অর্জুনের; মেনে নিচ্ছি ভগবদগীতায় শ্রী ভগবানের উক্তিই প্রামাণ্য, অর্জুনের নয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বক্তব্য খণ্ডন তো করেনই নি, বরঞ্চ সে বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থন করে এবং অর্জুনকেও ছাড়িয়ে গিয়ে নারীদের 'পাপযোনি' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন: 'মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহ্যপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ/স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেপি যান্তি পরাং গতিম্॥' (গীতা, ৯:৩২) অর্থাৎ 'আমাকে আশ্রয় করে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এসব পাপযোনিরাও পরম গতি লাভ করে থাকে'। [সুত্র- অনন্ত বিজয় দাশ, মুক্তমনা, 'সনাতন ধর্মের দৃষ্টিতে নারী']

গীতায় বর্ণীত ৯:৩২ শ্রীকৃষ্ণের উক্তিটি অত্যন্ত নোংরা, চরম আপত্তিকর। কৃষ্ণ বলছেন এমন কথা ভাবতেও অবাক লাগে। নারী জাতির প্রতি ভগবান কৃষ্ণের এইরকম নোংরা দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই অগ্রহযোগ্য ও নিন্দনীয়! অথচ এই নারীরাই প্রভাত-স্নান সেরে পবিত্র হয়ে প্রতিদিন ভক্তি ভরে গীতা পাঠ করেন। তারা কৃষ্ণের নামে কীর্তন করে চোখের জলে বুক ভাসান। হিন্দু নারীরা কি জানেন এই গীতায় কৃষ্ণ তাদেরকে কী বিশ্রী ভাষায় অপমান করেছেন?

যদিও বলা হয় হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ্ বেদ কিন্তু জীবন ধারনের সকল পদ্ধতি যেমন প্রতিমাপূজা, উপাসনা, ব্রতাচারণ বিবাহের নিয়মাবলী, শ্রাদ্ধবিধি, খাদ্য বিধি, বর্ণাশ্রম বিধি, সম্পত্তি বণ্টনসহ যাবতীয় সবকিছুই 'মনুসংহিতা' বা 'মনুস্মৃতি'র নিয়ম মেনে করা হয়। একজন হিন্দু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কী করলে ইহলোকে ও পরলোকে পুরষ্কৃত হবেন এবং কী না করলে দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি ভোগ করবেন তার বিষদ বর্ণনা আছে ভগবান মনুর এই মনুসংহিতায়। এটাই হিন্দুদের জীবনবিধান তথা 'কোড অফ লাইফ'। বেদে কী আছে আর কী নাই তাতে কিছুই যায় আসেনা বাস্তবে কী আইন মানা হয় সেটাই আসল কথা। আমরা নারীদের প্রতি মনুর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি এবার কিছুটা ফিডব্যাক করা যাক।

মনুর বিধান অনুযায়ী-

(ক) স্ত্রীলোক পতিসেবা করবে। তাঁর স্বাধীন কোনো সত্তা নেই।

(খ) নারীকে কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করবে।

(গ) স্ত্রীলোকের পৃথক কোনো যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস বিধান নেই।

(ঘ) স্ত্রীলোকের সাক্ষী হওয়ার বা স্বাধীনভাবে ঋণ করার অধিকার নেই।

(ঙ) স্ত্রী, অপরাধ করলে সূক্ষ্ম দড়ির দ্বারা কিংবা বেতের দ্বারা শাসনের জন্য প্রহার করবে।

(চ) রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা প্রহার যদি করতে হয়, তাহলে শরীরের পশ্চাৎভাগে প্রহার কর্তব্য; কখনো উত্তমাঙ্গে বা মাথায় যেন প্রহার করা না হয়।

(ছ) টাকাকড়ি ঠিকমতো হিসাব করে জমা রাখা এবং খরচ করা, গৃহ ও গৃহস্থালী শুদ্ধ রাখা, ধর্ম-কর্মসমূহের আয়োজন করা, অন্নপাক করা এবং শয্যাসনাদির তত্ত্বাবধান করা- এই সব কাজে স্ত্রীলোকদের নিযুক্ত করে অন্যমনস্ক রাখবে।

(জ) স্ত্রীলোকগণকে প্রথমে যে বাগদান করা হয়, তার দ্বারাই স্ত্রীলোকের উপর পতির স্বামীত্ব জন্মায়; অতএব বাগদান থেকে আরম্ভ করেই স্ত্রীলোকদের স্বামীর সেবা করা কর্তব্য।

(ঝ) বিবাহযোগ্য সময়ে অর্থাৎ ঋতুদর্শনের আগে পিতা যদি কন্যাকে পাত্রস্থ না করেন, তাহলে তিনি লোকমধ্যে নিন্দনীয় হন; স্বামী যদি ঋতুকালে পত্নীর সাথে সঙ্গম না করেন, তবে তিনি লোকসমাজে নিন্দার ভাজন হন।

(ঞ) উৎকৃষ্ট অভিরূপ এবং সজাতীয় বর পাওয়া গেলে কন্যা বিবাহের বয়োঃপ্রাপ্ত না হলেও তাকে যথাবিধি সম্প্রদান করবে।

(ট) ত্রিশ বৎসর বয়সের পুরুষ বারো বৎসর বয়সের মনোমত কন্যাকে বিবাহ করবে, অথবা, চব্বিশ বছর বয়সের পুরুষ আট বছরের কন্যাকে বিবাহ করবে। এর দ্বারা বিবাহযোগ্য কাল প্রদর্শিত হলো মাত্র। তিনগুণের বেশি বয়সের পুরুষ একগুণ বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করবে, এর কম বেশি বয়সে বিবাহ করলে ধর্ম নষ্ট হয়।

(ঠ) বরের নিকট থেকে পণ নেওয়ার সময়ে একটি কন্যাকে দেখিয়ে বিবাহের সময়ে যদি বরকে অন্য একটি মেয়ে দেওয়া হয়, তা হলে সেই বরটি ঐ একই শুল্কে দুইটি কন্যাকেই পাবে।

(ড) যার উদ্দেশ্যে কন্যা বাগদত্তা হবে, তার মৃত্যুর পরও বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজের ঐ বাগদত্তা কন্যাকে আবার অন্য পুরুষকে সমর্পণ করবে না।

এবার সংক্ষেপে শূদ্র জনজাতির প্রতি ব্রাহ্মণ মনুর নির্দয়তা নিষ্ঠুরতার কিছু নমুনা দেখা যাক-

(ক) শূদ্রদের নিজস্ব কোনো সম্পত্তি রাখার অধিকার নেই।

(খ) দাস ও শূদ্রের ধন ব্রাহ্মণ অবাধে নিজের কাজে প্রয়োগ করবেন।

(গ) শূদ্র অর্থ সঞ্চয় করতে পারবে না। কারণ তাঁর সম্পদ থাকলে সে গর্বভরে ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করতে পারে।

(ঘ) প্রভু কর্তৃক পরিত্যক্ত বস্ত্র, ছত্র, পাদুকা ও তোষক প্রভৃতি শূদ্র ব্যবহার করবে।

(ঙ) প্রভুর উচ্ছিষ্ট শূদ্রের ভক্ষ্য।

(চ) দাসবৃত্তি থেকে শূদ্রের কোনো মুক্তি নেই।

(ছ) যজ্ঞের কোনো দ্রব্য শূদ্র পাবে না।

(জ) ব্রাহ্মণের নিন্দা করলে শূদ্রের জিহ্বাচ্ছেদন বিধেয়।

(ঝ) ব্রাহ্মণ শূদ্রের নিন্দা করলে যৎসামান্য জরিমানা দেয়।

(ঞ) ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রহত্যা সামান্য পাপ।

(ট) শূদ্র কর্তৃক ব্রাহ্মণ হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

(ঠ) শূদ্র সত্য কথা বলছে কি না তাঁর প্রমাণ হিসাবে তাকে দিব্যের আশ্রয় নিতে হবে। এতে তাকে জলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়ে হাঁটতে হয় অথবা জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। অদগ্ধ অবস্থায় অথবা জলমগ্ন না-হয়ে ফিরলে তাঁর কথা সত্য বলে বিবেচিত হবে।

(ড) ব্রাহ্মণকে প্রহার করলে শূদ্রের হাত কেটে ফেলা বিধেয়।

(ঢ) ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসলে তাঁর কটিদেশে তপ্তলৌহ দ্বারা চিহ্ন এঁকে তাকে নির্বাসিত করা হবে অথবা তাঁর নিতম্ব এমনভাবে ছেদন করা হবে যাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

(ণ) ব্রাহ্মণের ন্যায় উপবীত বা অন্যান্য চিহ্ন ধারণ করলে শূদ্রের মৃত্যুদণ্ড বিধেয়।

(ত) যে পথ দিয়ে উচ্চ বর্ণের লোকেরা যাতায়াত করেন, সেই পথে শূদ্রের মৃতদেহও বহন করা যাবে না।

(থ) ব্রাহ্মণের গায়ে থুথু দিলে শূদ্রের ওষ্ঠচ্ছেদন হবে।

(দ) ব্রাহ্মণের প্রতি মূত্র নিক্ষেপ করলে শূদ্রের যৌনাঙ্গ ছেদন করা হবে এবং অধোবায়ু ত্যাগ করলে গুহ্যদেশ ছেদন করা হবে।

(ধ) শূদ্র যদি হিংসার বশবর্তী হয়ে ব্রাহ্মণের চুল, চিবুক, পা, দাড়ি, ঘাড় এবং অণ্ডকোষে হাত দেয় তাহলে নির্বিচারে তাঁর দুটি হাতই কেটে দেওয়া হবে।

(ন) সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ না করে শূদ্রা নারীকে প্রথমে বিবাহ করে নিজ শয্যায় গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ অধোগতি প্রাপ্ত হন; আবার সেই স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েন।

(প) কোনো দ্বিজাতি-নারী (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নারী) স্বামীর দ্বারা রক্ষিত হোক বা না-ই হোক, কোনো শূদ্র যদি তার সাথে মৈথুন ক্রিয়ার দ্বারা উপগত হয়, তাহলে অরক্ষিতা নারীর সাথে সঙ্গমের শাস্তিস্বরূপ তার সর্বস্ব হরণ এবং লিঙ্গচ্ছেদনরূপ দণ্ড হবে, আর যদি স্বামীর দ্বারা রক্ষিতা নারীর সাথে সম্ভোগ করে তাহলে ওই শূদ্রের সর্বস্বহরণ এবং মরণদণ্ড হবে।

মনুঃস্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, পুরাণসহ হিন্দুদের সকল ধর্মগ্রন্থের মূলগ্রন্থ হলো 'বেদ'। এবার আমরা দৃষ্টিপাত করবো হিন্দু ধর্মের মূলগ্রন্থ 'বেদ' এর উপর।

"সদা-সর্বত্র বিরাজমান তন্দ্রা-নিদ্রাহীন সদা সজাগ প্রতিনিয়ত করূণা বর্ষণকারী সর্বশক্তিমান হে প্রভূ! আমরা শূধু তোমারই মহিমা স্মরণ করি, তোমারই জয়গান গাই। প্রভূ হে! আমাদের সর্বোত্তম আত্নিক পথে, আলোকিত পথে পরিচালনা করো। আমরা যেন সব সময় সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকে অনূধাবন করতে পারি"।

নাহ, এটি কোরানের সুরা ফাতিহার বঙ্গানুবাদ নয়। সুরা ফাতিহা যেমন প্রার্থনা এটিও একটি প্রার্থনা তবে এগুলো 'ঋগবেদ' এর আয়াত। [ঋগবেদঃ ৩.৬২.১০]

এটি প্রায় শতাধিক গ্রন্থের সমষ্টি। বেদ চার ভাগে বিভক্ত যথা,

১) ঋগবেদ।

২) সামবেদ।

৩) যজুর্বেদ।

৪) অথর্ববেদ।

এই চারটি বেদের প্রতিটি আবার চারটি করে অংশে বিভক্ত। এগুলো হলো (১) সংহিতা (২) ব্রাহ্মণ (৩) আরণ্যক (৪) উপনিষদ্।

'সংহিতা' অংশে লিপিবদ্ধ হয়েছে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, বিষ্ণু, রুদ্র প্রমুখ বৈদিক দেবতার বিভিন্ন মন্ত্র ও স্তবস্তুতি। 'ব্রাহ্মণ' অংশে রয়েছে মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও যাগযজ্ঞের নিয়মকানুন। 'আরণ্যক' অংশে রয়েছে বনবাসী তপস্বীদের যজ্ঞভিত্তিক বিভিন্ন ধ্যানের বর্ণনা। ঋগমন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞে দেবতাদের আহ্বান করা হয়, যজুর্মন্ত্রের দ্বারা তাঁদের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করা হয় এবং সামমন্ত্রের দ্বারা তাঁদের স্তুতি করা হয়।

বৈদিক মন্ত্র পড়ে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, বিষ্ণু, রুদ্র প্রমুখ দেবতাদের উপর দরুদ পড়া হয় তাদের প্রশংসা করা হয় আর দেবতাদের কাছে দোয়া করা হয় বালা মুছিবত থেকে রক্ষা করার জন্যে, শত্রুর উপর জয়লাভ করানোর জন্যে এবং প্রচুর ধন-সম্পদ দান করার জন্যে। মুসলমানদের দোয়া-দরুদের কিতাবে যা কিছু আছে বেদেও তার সবটুকুই আছে। অসংখ্য দোয়া দরুদ আছে এই বেদে। তবে কি এটি শুধু দেবস্তুতি আর প্রার্থনার কিতাব?

এবার বেদের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করা যাকঃ
“হে ঈশ্বর, যারা দোষারোপ করে বেদ ও ঈশ্বরের তাদের উপর তোমার রাগ বর্ষণ করো।” (ঋগবেদ ২।২৩।৫)

“যে লোক ঈশ্বরের আরাধনা করেনা এবং যার মনে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ নেই, তাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে হত্যা করতে হবে।” (ঋগবেদ ১।৮৪।৮)

“গবাদিপশুগুলো কী করছে নাস্তিকদের এলাকায়, যাদের বৈদিক রীতিতে বিশ্বাস নেই? যারা সোমার সাথে দুধ মিলিয়ে উৎসর্গ করে না এবং গরুর ঘি প্রদান করে যজ্ঞও করে না? ছিনিয়ে আনো তাদের ধনসম্পদ আমাদের কাছে”। (ঋগবেদ ৩।৫৩।১৪)

"কীকটবাসী [বেদের বাহিরের লোক] তাহারা গাভীর কি উপযোগ নেয়, না পানযোগ্য দুধাদি দোহন করে, এবং না ঘৃতকে উত্তপ্ত করে। হে ঐশ্বর্যবান! নিজ ধন আমোদ প্রমোদে ব্যয়কারী পুরুষের ধনকে আমাদের প্রাপ্ত করাও আমাদের মধ্যে কুপ্রবৃত্তিবান লোক কে দমন করো"। (ঋগবেদ ৩/৫৩/১৪, জয়দেব শর্মা)

“তাদেরকে হত্যা করো, যারা বেদ ও উপাসনার বিপরীত”। (অথর্ববেদ ২০।৯৩।১)

"তাদের যুদ্ধের মাধ্যম বশ্যতা স্বীকার করাতে হবে”। (যজুর্বেদ ৭/৪৪)

“সেনাপ্রধান হিংস্র ও নির্দয়ভাবে শত্রুদের পরিবারের সদস্যদের সাথেও যুদ্ধ করবে।” (যজুর্বেদ ১৭।৩৯)

“শত্রুদের পরিবারকে হত্যা করো, তাদের জমি ধ্বংস করো”। (যজুর্বেদ ১৭/৩৮)

"হে সেনাপ্রধান, আমাদের আশা পুর্ণ করো। হে ধনসম্পদের বাদশা, তোমার সহায়তায় আমরা যেন সম্পদশালী হতে পারি এবং যুদ্ধে জয় লাভ করে প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হতে পারি।” (যজুর্বেদ ১৮/৭৪)

এগুলো বেদের শেখানো দোয়া। কিন্তু কথা হলো বেদের শত্রু কারা? যারা বেদের বাহিরে বা বেদে যাদের বিশ্বাস নেই, এককথায় বৈদিক ধর্মের বাহিরে যারা তারাই হিন্দুদের শত্রু। ঠিক যেমন, যারা কোরানের ভেতরে তারাই ইমানদার মুসলমান, আর যারা এর বাহিরে তারা অমুসলিম কাফির। এবার আমাদেরকে জানতে হবে ‘বেদ’ এর জন্মদাতা কে বা কারা।

লেখক রণদীপম বসু তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেন:
“ধর্মীয় অমানবিকতার আদিম ধারাটির নাম বৈদিকসংস্কৃতি। জগতজুড়ে ধর্মীয় সংস্কৃতির যে ক’টি প্রধান ধারার অস্তিত্ব এখনো বহাল রয়েছে তার মধ্যে সম্ভবত বৈদিক সংস্কৃতিই প্রাচীনতম। তার উৎস হচ্ছে বেদ (Veda), যা বর্তমান হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। অথচ বহিরাগত একদল লিপিহীন বর্বর আক্রমণকারী শিকারী আর্য গোষ্ঠির দ্বারা এককালের আদিনিবাসী জনগোষ্ঠির মাধ্যমে গড়ে ওঠা সমৃদ্ধ প্রাচীন হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস হওয়া এবং এই ধ্বংসাবশেষের উপর ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠা আর্য সংস্কৃতির বিকাশের আর্যাবর্ত ধারাক্রমই মূলত এই বৈদিক সংস্কৃতি। যেখানে আর্যরা (Aryan) হয়ে ওঠে মহান শাসক আর আদিনিবাসী জনগোষ্ঠিটাই হয়ে যায় তাদের কাছে অনার্য বা শাসিত অধম, নামান্তরে দাস বা শূদ্র (Sudra)। তাই এই বৈদিক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের মধ্যেই একটি সভ্যতার উন্মেষ ও

পর্যায়ক্রমে তার মাধ্যমে ধর্ম নামের একটি শাসনতান্ত্রিক ধারণার জন্ম ও আধিপত্য কায়েমের মধ্য দিয়ে এ ব্যবস্থার পরিণতি পর্যবেক্ষণ করলেই ধর্ম কী ও কেন- এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় বলে বিদ্বানেরা মনে করেন। আর প্রতিটা ধর্মেরই যেহেতু অন্যতম প্রধান শিকার হচ্ছে নারী, তাই আধিপত্যবাদী পুরুষতন্ত্রের ধারক ও বাহক এই ধর্মের প্রত্যক্ষ আক্রমণে কিভাবে সামাজিক নারী তার পূর্ণ মানব সত্তা থেকে সমূলে বিতাড়িত হয়ে কেবলই এক ভোগ্যপণ্য চেতনবস্তুতে পরিণত হয়ে যায় তারও উৎকৃষ্ট নমুনা-দলিল এই প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রই। বয়সে প্রবীণ এই শাস্ত্রের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ও সাফল্য থেকেই সম্ভবত পরবর্তী নবীন ধর্মশাস্ত্রগুলো তাদের পুরুষতান্ত্রিক শোষণের হাতিয়ারটাকে আরেকটু আধুনিক ও বৈচিত্র্যময় করে তার শাসন-দক্ষতাকেই সুচারু করেছে কেবল, খুব স্বাভাবিকভাবেই কোন মৌলিক মানবিক উন্নতি ঘটেনি একটুও”।

ঠিক একইভাবে একদিন মুসলিম খলিফারা পারস্য আক্রমণ করে তাদের সহস্র বছরের কৃষ্টি সংস্কৃতি ধ্বংস করেছিলেন। সেদিন মরুদস্যুদের হাতে ছিল ‘কোরান’ আর সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসকালে আর্যদের হাতে ছিল ‘বেদ’। অনার্যদের শাসন-শোষণ করার জন্যে ভারতীয়দের পদানত করে রাখার লক্ষ্যে বহিরাগত লুটেরা ডাকাত আর্যদের একখানি ধর্মগ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। সেই ধর্মগ্রন্থটির নাম ‘বেদ’। কালের পরিবর্তনে যুগের প্রয়োজনে ‘বেদ’-এর রূপের আকারের অনেক পরিবর্তন পরিমার্জন পরিবর্ধন, সংযোজন হয়েছে। প্রকৃতির কার্যকারণ নির্ধারণে ব্যর্থ কিছু অসহায় অশিক্ষিত মানুষের কল্পনা থেকে সৃষ্ট এই গ্রন্থখানি একসময় ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ আর শাসকদের প্রজা নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক যুগে এসে কীভাবে সে গ্রন্থখানি বিজ্ঞানময় কিতাব হয়ে গেলো আমরা এবার সেই প্রশ্নের সলুকসন্ধান করবো।

মডারেট মুসলমানগণ যেসকল বৈজ্ঞানিক তথ্যসূত্র ১৫ শো বছর পূর্বের লেখা কোরানে পেয়েছেন বলে দাবি করেন, মডারেট হিন্দুগণও দাবি করেন তারা ৫ হাজার বছর পূর্বে লেখা বেদে বিজ্ঞানের যতোকিছু আবিষ্কার তার সকল সূত্র খুঁজে পেয়েছেন।

পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে মাঝে মাঝে হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মগ্রন্থের তুলনা করা হয়েছে। কোনো ধর্ম তুলনামূলকভাবে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বুঝানোর জন্যে নয়। উভয় ধর্মের দাবি, এ পর্যন্ত বিজ্ঞান এমনকিছু আবিষ্কার করতে পারেনি যার সূত্র কোরান বা বেদে নেই। বিশ্বসৃষ্টি, মহাবিস্ফোরণ (বিগ ব্যাং), ছায়াপথ সৃষ্টির আগে মহাশুন্যের অবস্থা, গোলাকার পৃথিবী, চাঁদের প্রতিফলিত আলো, আলোর গতি, সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব, মহাশূন্যে বস্তুর অস্তিত্ব (ডার্ক ম্যাটার), ভ্রুণতত্ত্ব, বিবর্তনবাদ, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণন, ইলেকট্রন-নিউটন-প্রোটনের ব্যাখ্যা, মহাকর্ষ শক্তি, মধ্যাকর্ষণ, কোয়ান্টাম থিওরি, আপেক্ষিক তত্ত্ব, স্ট্রিং থিওরি, ব্লাক হোল থিওরি, এমন কি হালের হিগস-বোসন কণাও উভয় ধর্মবাদীরা তাদের ধর্মগ্রন্থ কোরান ও বেদে আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

এক ধর্মের সূর্যদেব আকাশে পংখিরাজ ঘোড়া দৌড়িয়ে বা রথভ্রমণ করে পৃথিবীর শেষপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, আরেক ধর্মের জুলকারনাইন পঙ্কিল জলাশয়ে পেয়েছিলেন পৃথিবীর সীমানা। জুলকারনাইন যখন পঙ্কিল জলাশয়ে এসে সূর্যকে ডুবতে দেখেন, তখন তো মানতেই হয় পৃথিবী গোল নয় বরং বিছানো কার্পেটের মতো সমতল। আর সূর্যদেব যখন ঘোড়ায় চড়ে পৃথিবী ঘুরে দেখে যান তখন তো মানতেই হয় পৃথিবী স্থির অবিচল দাঁড়িয়েই ছিল পৃথিবীর আর ঘোরারই দরকার নেই।

হাজার বছরের অনুসন্ধান, গবেষণা করে সীমাহীন অর্থ ব্যয় করে, উচ্চমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সারাবিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণ এ যাবত যা কিছু আবিষ্কার করলেন, মুদিত চোখে ধ্যান করে করে একদল ঋষি, আরেকজন হেরা পাহাড়ের গুহার ভিতরে বসে বসে আবিষ্কার করেছিলেন সেই সকল আবিষ্কারের তথ্যসুত্র! কীসব বৈজ্ঞানিকসূত্র লিখে গেছেন তারা একটু দেখা যাক;

এবারও প্রথমে কোরান থেকে সামান্য কিছু উদাহরণ-

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (১) যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে

وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ (২) যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে,

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ (৩) যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে,

إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ (৪) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (৫) তোমরা কি লক্ষ্য করো না যে,আল্লাহ কীভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন?

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (৬) এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (৭) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা।

(১) 'যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে'

(২) 'যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে'

(৩) 'যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে' এই আয়াত তিনটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলোঃ তারকাগুলোর জ্বালানী যে ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যাচ্ছে এবং আলোবিহীন হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে অর্থাৎ অবশেষে শ্বেতবামন অথবা নিউট্রন তারকায় পরিণত হচ্ছে, সেই ইংগিতটিই এখানে ফুটে উঠেছে। তারারা সুপারনোভা এক্সপ্লোশনের পর হয় নিউট্রন তারা কিংবা ব্লাকহোলে পরিণত হয়, এখানে তার ইঙ্গিত আছে।

(৪) 'যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে'

(৫) 'তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ কীভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন' এই আয়াত দুটোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলোঃ 'আকাশ' বলতে বায়ূমণ্ডলের সাতটি স্তর বোঝানো হয়েছে।

(৬) 'এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে' এই আয়াতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলো- চন্দ্রের আলো সূর্যের প্রতিফলিত আলো, এখানে চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই বোঝানো হয়েছে।

আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় নতুন যে শব্দগুলো সংযোজন করা হলো যেমন; শ্বেতবামন অথবা নিউট্রন তারকা, সূর্যের প্রতিফলিত আলো, বায়ূমণ্ডল, সুপারনোভা এক্সপ্লোশন, এগুলো কোন্ আয়াতের কোন্ কোন্ শব্দের অর্থ?

এবার দেখা যাক বেদে বিশ্বাসীগণ কী বলেন-

"বেদ শুধুমাত্র একটি ধর্মগ্রন্থই নয়। ইহাতে বিজ্ঞানও ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে রয়েছে। প্রাতঃকালে অধিক জল পান যাকে ঊষাপান বলে, সূর্য প্রণাম, ধ্যান, যজ্ঞ, প্রাণায়াম ইত্যাদি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। এমন কি পৃথিবী যে ঘূর্ণয়মান তা আমরা বেদ থেকেই জানতে পারি। এবং বিশ্বে বহুল আলোচিত পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্বের যে 'বিগ ব্যাং' তত্ত্ব রয়েছে তার স্পষ্ট বর্ণনা আমরা বেদে পাই, যা বিজ্ঞানীরা মাত্র কয়েক বৎসর হলো আবিষ্কার করেছে। কিন্তু বেদে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। তাহলে এতো বৎসর পূর্বে এই জ্ঞানটা আসলো কীভাবে? এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বেদ ঈশ্বরের বাণী"।

'বেদের আলোকে মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব' শিরোনামে 'এইবেলাডটকম' নামের একটি ওয়েব পেইজে লিখিত একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে দেয়া হলো-

"বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব একটা মূখ্য আলোচনার বিষয়। ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম একক ধর্মগ্রন্থভিত্তিক হওয়ায় সৃষ্টিতত্ত্ব প্রায় একই রকম। কিন্তু হিন্দু ধর্মে রয়েছে অজস্র ধর্মগ্রন্থ। মূল বেদ-এ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ৪টি সংহিতা, ১২টা উপনিষদ ও অনেকগুলো ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক গ্রন্থ। এছাড়া ১৮ খানা মহাপুরাণ ও ১৮ খানা উপপুরাণ রয়েছে, যার প্রত্যেকেই একেকটা মহাকাব্যের সমান। এই বিশাল শাস্ত্র-সমুদ্রের অনেক জায়গায় পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। বেদের তথ্যই হিন্দুধর্মে মূল প্রামাণ্য ও সর্বমান্য। তাহলে, বেদ কী বলছে বিশ্বজগতের সৃষ্টি সম্পর্কে? আসুন জেনে নিই হিন্দুধর্ম অনুযায়ী এই বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব।

বেদের 'নাসাদীয় সূক্ত' ও 'হিরণ্যগর্ভ সূক্ত' এই দুটি সূক্তে মহাবিশ্ব সৃষ্টির অপূর্ব রহস্য বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সূক্ত দুটি আধুনিক বিজ্ঞানী মহলে ব্যাপক আলোচিত। কারণ, সূক্ত দুটিতে মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা বর্তমান বিজ্ঞানের ধারণার সাথে প্রায় পূর্ণাঙ্গ মিলে যায়। দেখে নেয়া যাক নাসাদীয় সূক্ত ও হিরণ্যগর্ভ সূক্তে কী বলা হয়েছে:

সেকালে যা নেই তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না। পৃথিবী ছিল না, অতি দূরবিস্তৃত আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কী ছিল? কোথায় কার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল?- রিগবেদ, ১০/১২৯/১

তখন মৃত্যু ছিল না, অমরত্ব ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যুক্ত হয়ে জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।- রিগবেদ, ১০/১২৯/২

সর্বপ্রথম অন্ধকার দ্বারা আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সে সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে এক বস্তুর জন্ম নিলেন। সেখান থেকে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হল।- রিগবেদ, ১০/১২৯/৩

বেদের হিরণ্যগর্ভ সূক্তে বলা হয়েছে:
সর্বপ্রথম হিরণ্যগর্ভই সৃষ্টি হল অর্থাৎ সর্বপ্রথম জলময় প্রাণের উৎপত্তি হয়। এখানে প্রথম প্রাণকে প্রজাপতি (ব্রহ্মা) বলা হয়েছে।- রিগবেদ, ১০/১২১/১

ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করে ছিল, সেখানে অগ্নির উৎপত্তি হল। এভাবে গলিত উত্তপ্ত তরল থেকে প্রাণরূপ দেবতার উদ্ভব হয়।- রিগবেদ, ১০/১২১/৭

গলিত পদার্থের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটল। একক বিন্দু থেকে সকল কিছু প্রসারিত হতে শুরু করল। তার এক জীবনপ্রদ অংশ থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হল। বিস্ফোরিত অংশসমূহ

থেকে বিভিন্ন গ্রহ, নক্ষত্র তৈরি হল। তারপর সৃষ্ট ক্ষেত্রে সাতধাপে সংকোচন-প্রসারণ সম্পন্ন হল। তারপর সৃষ্টি হল ভারসাম্যের।- রিগবেদ, ১০/৭২/২-৪, ৮-৯

এখানে মানুষের মনে জাগরিত প্রশ্নগুলোকে ঋষি সাজিয়ে উত্তর দিয়েছেন যা বৈজ্ঞানিক যুক্তি নির্ভর; কোনো মনগড়া কথা নয়"। [এইবেলাডটকম/এমআর]

ব্যস! বেদের এই 'নাসাদীয়' ও 'হিরণ্যগর্ভ' আয়াতগুলোতেই বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব?

তাপস ঘোষ নামের আরেকজন লেখক (শিক্ষক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ) 'ওম সভা' নামের একটি ওয়েবপেইজে লিখেছেন;

"ঈশ্বর কণা বা God Particle বর্তমান পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে বহুচর্চিত একটি বিষয়। বিষয়টির সাথে সরাসরি প্রচলিত ঈশ্বরের ধারণার কোনো মিল না থাকলেও অধ্যাত্মবাদী ঈশ্বরবিশ্বাসী, বিশেষতঃ বেদান্ত দর্শনে বিশ্বাসী মানুষ God Particle এর ধারণার মধ্যে খুঁজে পেতে পারেন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কিত ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শনের তত্ত্বগত সমর্থন।

আমেরিকায় বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ যখন ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শনের বিজয় পতাকা ওড়াচ্ছেন তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী টেসলা (Sir Nikola Tesla)। টেসলার সাথে স্বামীজির আলোচনা হয় ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শনের 'আকাশ' ও 'প্রাণ' তত্ত্ব সম্পর্কে। সাংখ্য দর্শনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলেছিলেন, 'আমরা যাহাদিগকে জড় ও শক্তি বলি... ইহাদের অতি সূক্ষ্ম অবস্থাকেই প্রচীন দার্শনিকগণ 'প্রাণ' ও 'আকাশ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। আকাশই আদিভূত-উহা হইতেই সমুদয় স্থূলবস্তু উৎপন্ন হইয়াছে আর উহার সঙ্গে 'প্রাণ' নামে আর একটি বস্তু থাকে। এই প্রাণ ও আকাশ... নানারূপে মিলিত হইয়া এই-সমুদয় স্থূল প্রপঞ্চ গঠন করিয়াছে, অবশেষে কল্পান্তে ঐগুলি লয়প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও

প্রাণের অব্যক্তরূপে প্রত্যাবর্তন করে। জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে সৃষ্টি বর্ণনাত্মক একটি (রিগবেদ, ১০/ ১২৯) নাসদীয় সূক্ত আছেঃ 'যখন সৎ ও ছিল না, অসৎ ও ছিল না, অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, তখন কী ছিল?' আর ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে: 'ইনি-সেই অনাদি অনন্ত পুরুষ-গতিশূন্য বা নিশ্চেষ্টভাবে ছিলেন।'

প্রাণ ও আকাশ তখন সেই অনন্ত পুরুষে সুপ্তভাবে ছিল, কিন্তু কোনরূপ ব্যক্ত প্রপঞ্চ ছিল না। এই অবস্থাকে 'অব্যক্ত' বলে। উহার ঠিক শব্দার্থ স্পন্দন-রহিত বা অপ্রকাশিত। একটি নূতন কল্পের আদিতে এই অব্যক্ত স্পন্দিত হইতে থাকে, আর প্রাণ আকাশের উপর ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত করে, আকাশ ঘনীভূত হইতে থাকে, আর ক্রমে... পরমাণু গঠিত হয়। এইগুলি পরে আরো ঘনীভূত হইয়া দ্ব্যণুকাদিতে পরিণত হয় এবং সর্বশেষে প্রাকৃতিক প্রত্যেক পদার্থ যে যে উপাদানে নির্মিত, সেই-সকল বিভিন্ন স্থূল ভূতে পরিণত হয়। ..." [স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা / ২য় খণ্ড]

অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা 'আকাশ' বলতে একটি unifiedfield (ক্ষেত্র) বুঝিয়েছেন যা সকল জড় পদার্থের উৎস। 'আকাশের' উপর 'প্রাণ' নামক আদি শক্তির ক্রিয়ায় এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব। পরবর্তীকালে নিশ্চল মহাকালের শরীরের উপর নৃত্যরতা কালীর প্রতীকী ধারণার উদ্ভবের পিছনেও সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের এই আধ্যাত্মিক সৃষ্টিতত্ত্বের প্রভাব ছিল। এই প্রাণ ও আকাশ অব্যক্ত অবস্থায় একীভূত, অর্থাৎ এরা স্বরূপতঃ অভিন্ন। সকল জড় পদার্থ ও শক্তির উৎস এই আকাশ ও প্রাণের স্বরূপতঃ অভিন্নতার তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা দাবি করে জড় জাগতিক সবকিছুই সকল পদার্থ ও শক্তিই স্বরূপতঃ অভিন্ন। এরা একেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। উপনিষদ শিক্ষা দেয়-

'তিনি সচল, তিনি স্থির; তিনি দূরে, তিনি নিকটে; তিনি এই সকলের ভিতরে, আবার তিনি এই সকলের বাহিরে। যিনি আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করেন, আবার সর্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কিছু গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। যে অবস্থায় জ্ঞানী

ব্যক্তির পক্ষে সর্বভূত আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, সেই একত্বদর্শী পুরুষের সেই অবস্থায় শোক বা মোহের বিষয় থাকেনা'।

বিজ্ঞানী টেসলাকে স্বামীজি বলেন জাগতিক পদার্থ ও শক্তিসমূহের এই অভিন্নতার তত্ত্বটি বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় কীনা তা দেখতে। অবশেষে ১৯০৫ সালে অর্থাৎ স্বামীজির দেহত্যাগের তিন বছরের মাথায় বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আবিষ্কার প্রমাণ করে দিল এই অভিন্নতার তত্ত্বকে। পদার্থ বিজ্ঞানে যুক্ত হলো একটি নতুন সমীকরণ- E=m c^2 এই সমীকরণ অনুযায়ী জড় ও শক্তি পরস্পর রূপান্তরযোগ্য, অর্থাৎ জড়পদার্থ এবং শক্তি স্বরূপতঃ অভিন্ন। জড়কে শক্তিতে এবং শক্তিকে ভরযুক্ত কণা বা জড়ে রূপান্তরিত করা সম্ভব - একথা তাত্ত্বিকভাবে পদার্থ বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলো। আইনস্টাইন বললেন,"Matter is nothing but frozen energy."। এরপর চলল শক্তিকণা (energy packet) কীভাবে ভরযুক্ত হয়ে জড়কণায় পরিণত হয় - এ নিয়ে অনুসন্ধান। 1964-65 সালে বিজ্ঞানী পিটার হিগস বললেন হিগস ক্ষেত্রের (Higgs field) কথা, যেক্ষেত্রে কোনো শক্তিকণা (energy packet) প্রবেশ করলে সেটি বস্তুকণায় পরিণত হবে। এই হিগস ক্ষেত্র আমাদের মনে করিয়ে দেয় ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শনের 'আকাশ' নামক সেই আদি ক্ষেত্রের (field) কথা যার উপর 'প্রাণ' নামক আদিশক্তির ক্রিয়ায় জড়ের উৎপত্তি"।

বেদের 'নাসাদীয় সূক্ত' ও 'হিরণ্যগর্ভ সূক্ত'গুলোর ভিতরে ৫ হাজার বছর যাবৎ গোপন ছিল মহাবিশ্ব সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক তথ্যসূত্র, সেগুলো একটু রিক্যাপ করা যাক-

(রিগবেদ, ১০/১২৯/২) 'সেকালে যা নেই তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না'।

তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যুক্ত হয়ে জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সে সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে এক বস্তুর জন্ম নিলেন

(রিগবেদ,১০/১২১/১) 'সর্বপ্রথম হিরণ্যগর্ভই সৃষ্টি হল অর্থাৎ সর্বপ্রথম জলময় প্রাণের উৎপত্তি হয়, এখানে প্রথম প্রাণকে প্রজাপতি (ব্রহ্মা) বলা হয়েছে"।

জগতের কোন্ পাঠশালায়, বিজ্ঞানের কোন্ শাখায় কোন্ গবেষণাগারে এই আয়াতগুলো নিয়ে গবেষণা হয়?

আসলে কী কথাগুলো বেদের ঋষিগণ তপস্যা করে করে তাদের কিতাবে লিখে গেছেন তা এবার আমরা দেখবো। তার আগে শ্রীমদ্ভগবদ গীতায় ভগবান কৃষ্ণের মজাদার একটি বাণী পড়া যাক;

yathā dīpo nivāta-stho

neṅgate sopamā smṛtā

yogino yata-cittasya

yuñjato yogam ātmanaḥ

As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist, whose mind is controlled, remains always steady in his meditation on the transcendent self. (Bhagavad Gita 6.19)

'বাতি বা প্রদীপ যেমন বায়ূহীন জায়গায় দোলেনা' এর অর্থটা কী? বায়ূহীন জায়গায় প্রদীপ যে জ্বলেনা কৃষ্ণ কি তা জানতেন?

ঋগবেদ থেকে আরো কিছু আয়াত তেলাওয়াত করা যাক,

"Oh Man! He who made the trembling earth static is Indra." (Rig Ved 2/12/12)

'হে মনুষ্য! যে এই কম্পিত পৃথিবীকে স্থির করেছেন তিনি ইন্দ্র'

“The God who made the earth stable” (Yajur Ved 32/6)

‘ঈশ্বর এই পৃথিবীকে স্থির রূপে তৈরি করেছেন’।

“Indra protects the wide earth which is immovable and has many forms” (Atarv Ved 12/1/11)

‘ইন্দ্র এই পৃথিবীকে রক্ষা করেন যা স্থির এবং অনেক রূপযুক্ত’।

“Let us walk on the Wide and Static earth” (Atharv Ved 12/1/17)

‘প্রশস্ত স্থীর পৃথিবীর উপর হাটা যাক’।

"O, Bright sun, a chariot named harit with seven horses takes you to sky" (Rig Ved 1/50/8)

‘হে, উজ্জ্বল সূর্য, হৃত নামক সাত ঘোড়ায় চালিত রথ তোমাকে আকাশে নিয়ে যায়’।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী (Rig Ved 1/50/8) এ উল্লেখিত ‘সাত ঘোড়ায় চালিত রথ’ এর তরজমা করেছেন এভাবে *‘উক্ত মন্ত্রটিতে সাতটি ঘোড়া নয় বরং সূর্যের সাতটি কিরণের কথা বলা হয়েছে। এবং আমরা জানি যে, সূর্যের কিরণ বা রশ্মিতে সাতটি বর্ণ রয়েছে, যা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত’।*

এখন সাত ঘোড়া অর্থ যদি সাত রং হয়ে যায় তাহলে কার কী বা করার আছে?

এবার মহর্ষি দয়ানন্দ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা দিচ্ছেন,
"হে সবার দ্রষ্টা সুখ প্রদাতা জ্ঞানস্বরূপ জগদীশ্বর! যেভাবে হরিতাদি সাত,
যাহা রসকে হরণ করে, সেই কিরণ পবিত্র দীপ্তশীল সূর্যলোককে রমনীয় সুন্দররূপ লোকে প্রাপ্ত করি। সেভাবে তোমাদের গায়ত্রী আদি বেদ তথা সাত ছন্দ প্রাপ্ত করাই।”

"O, man, the sun who is most attractive, takes round of the earth, on his golden chariot through the sky and removes the darkness of the earth" (Yajur Ved 33/43)

'হে মনুষ্য, অত্যন্ত আকর্ষনীয় সূর্য আকাশে সোনার রথের উপর চড়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে এবং পৃথিবীর অন্ধকার দূর করছে।

"The Bull has supported the sky." (Yajur Ved: 4: 30)

'ষাঁড় আকাশ কে ধারন করে রেখেছে'।

এখানেও মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী উক্ত মন্ত্রে সংস্কৃত ভাষায় উল্লেখিত "বৃষভ" শব্দ অর্থাৎ ষাঁড়ের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন;

'সংস্কৃত ভাষায় 'বৃষভ' এর যৌগিক অর্থ হচ্ছে- শক্তিশালী, সামর্থবান এবং উত্তম। রুঢ়ি অর্থে ষাঁড়কে বৃষভ বলা যায় কারণ কৃষিক্ষেত্রে ষাঁড় শক্তির প্রতীক'।

তিনি দাবি করেন, মন্ত্রটির যথার্থ অর্থ হলো- "হে জগদীশ্বর! যেভাবে শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত পৃথিবীর আচ্ছাদনকারী হয় পৃথিবী আদি সৃষ্টির মধ্যে স্থাপন করার যোগ্য ব্যবস্থাকে স্থাপন করতে বা সূর্য আদিকে ধারণ করতে অত্যন্ত উত্তম অন্তরীক্ষকে রচনা করেন এবং উত্তমপ্রকার প্রকাশকে প্রাপ্ত হয়ে সবার অধিপতি আপনি অন্তরীক্ষের মধ্যে সমস্ত লোককে স্থাপন করেন, এভাবে যেসমস্ত শ্রেষ্ঠরূপ আপনার সত্য স্বভাব এবং কর্ম হয়। এরকম আমরা সবাই জানি"।

সত্যি কথা বলতে উপরোল্লেখিত কথাগুলোর মর্মোদ্ধারে আমি সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছি।

"This earth, verily becomes the jar, and heaven the cover of the Odana as it is cooking". অথর্ব্বেদ ১১/৩/১১

আকাশকে পৃথিবীর ছাদ বা ঢাকনা কল্পনা করা ছাড়া ৫ হাজার বছর পূর্বের কোনো ধর্মের কোনো মানুষের আর কোনো উপায় জানা ছিলনা। আকাশ যে কী, কেনইবা আকাশ নীল সেটাই তারা জানতেন না। বিজ্ঞান আকাশের ব্যাখ্যা দেয়ার আগ পর্যন্ত আদিকাল থেকে মানুষ আকাশকে শক্ত কাঁচের ছাদই মনে করতো।

তাই ঋগবেদ মণ্ডল ৪ সুক্ত ৪২ মন্ত্র ৩ এ বলা হয়েছে, "ভরুনা আকাশকে বানিয়েছেন শক্ত"।

বেদে আকাশকে ঢাকনা রূপক অর্থে বুঝালেও তা যে শক্ত তা স্পষ্ট। একই কথা আছে অথর্ববেদ ৬/৪৪/১ এ, "পৃথিবী স্থির ও নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে"।

অনুবাদক দেবীচাঁদ এই মন্ত্রের অনুবাদে লিখেছেন "পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে স্থির তার গুণাবলীর কারণে"।

পৃথিবী যে স্থির এর প্রমাণ বেদাংগেও রয়েছে। বেদাংগ (নিরুক্ত ১০/৩২) "সবিতা পৃথিবীকে স্থির করে রেখেছেন"।

থালা বিশেষ সমতল পৃথিবীর শেষপ্রান্ত আর গুম্বুজরূপী শক্ত কাঁচের তৈরি নীল আকাশের দিগন্ত নিয়ে জগতের সবদেশে সবধর্মে রচিত হয়েছে নানা ধরনের অদ্ভুত কেচ্ছা-কাহিনি।

Paul H. Seely তার 'দ্যা ফ্যামামেন্ট এন্ড দ্যা ওয়াটার এবোভ' (THE FIRMAMENT AND THE WATER ABOVE) প্রবন্ধে লিখেন,

"In India the earliest cosmology is found in the Rig Veda, a document from the middle of the second millennium BC. It contains a number of passages which show that Indians of that time believed in a solid firmament. In one creation hymn an unnamed god is mentioned "by whom the dome of the

sky was propped up" (10.121.5; cf. 1.154.1 and 2.12.2). Another hymn asks, "What was the wood...from which they carved the sky and the earth?" (10.81.4). Another says, "Firm is the sky and firm is the earth" (10.173.4). Several hymns mention people who "climb up to the sky" (8.14.14; 2.12.12; 1.85.7). Several hymns mention the separation of heaven and earth. One says Varuna "pushed away the dome of the sky" (7.86.1; cf. 10.82.1).

বেদের আরো কিছু আয়াত আছে যেমন-
(অথর্ববেদ ৯/৭/২) "আলোর জগত (সৌরজগত) হচ্ছে উপরের চোয়াল আর পৃথিবী হচ্ছে নীচের চোয়াল।"

(অথর্ববেদ ১৫/৭/১) "তিনি চলে গেলেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে"।

(ঋগবেদ ৭/৮৩/৩) "তিনি তাকালেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে"।

(যযূর্বেদ ১/১১) "তিনি (অগ্নিদেবতা) যজ্ঞের বেদী স্থাপন করলেন পৃথিবীর নাভি্দেশে ও আকাশের মধ্যস্থানে"।

পৃথিবী বহির্ভূত সকল বস্তু বা ঘটনা নিয়ে বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তারই নাম জ্যোতির্বিজ্ঞান। আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে কীভাবে বেদের 'নাসাদীয়' ও 'হিরণ্যগর্ভ' আয়াতগুলোতে বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষ্যানুযায়ী বেদে প্রাচীনযুগের ঋষিদের উল্লেখিত 'আকাশ ও 'বস্তু' শব্দ দুটোর আসল অর্থ 'জড়পদার্থ' ও 'শক্তি'। আর এখান থেকে গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন আপেক্ষিক তত্ত্ব, আলোর গতি, হিগস বোসন কণাসহ জ্যোতির্বিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব-সুত্র। তবে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের 'ভর-শক্তি' সমীকরণ E=m c^2 আর Theory of relativity আপেক্ষিক তত্ত্ব কিন্তু তার নিয়মিত শ্রীমদ্ভগবত গীতা পাঠ ও গীতা ধ্যানের ফসল। কীভাবে?

সংকীর্তন মাধব দাস নামের একজন ধার্মিক একটি প্রবন্ধে তার একদিনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে লিখেন;

“বহির্বিশ্বে শ্রীমদ্ভগবত গীতা প্রচারের প্রারম্ভিক ইতিহাস এবং আইনস্টাইনের গীতা সাধনা শীর্ষক প্রাঞ্জল এবং প্রাণবন্ত আলোচনা শুনেছিলাম এপার বাংলা, ওপার বাংলার পণ্ডিত প্রবর রাঁসমোহন চক্রবর্তী এম.এ, পিএইচ.ডি পুরাণরত্ন বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের কাছ থেকে ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা রামপালা ছাত্রাবাসে গীতা জয়ন্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে।

রাঁসমোহন চক্রবর্তীর উক্ত আলোচনা আজও অম্লান, আজও হৃদয়কে নাড়া দেয়। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্বের শেষ প্রহর। ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিল ভারতবর্ষে তাদের রাজত্বের মেয়াদ শেষ। তাদেরকে সবকিছু গুটিয়ে অচিরেই ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে। তারা চিন্তা করলো যদি ভারত ছেড়ে দিতে হয় তবে ভারত থেকে এমন এক অমূল্য সম্পদ তারা নিয়ে যাবে যার আবেদন বিশ্বজনীন এবং কালজয়ী। বলা বাহুল্য এই কালজয়ী অমূল্য সম্পদ আর কিছুই নয়, তা হলো ইংরেজিতে অনুবাদ করা শ্রীশ্রী মদ্ভগবত গীতা। Theory of relativity লিখে নোবেল বিজয়ী আইনস্টাইন তখন প্রিনস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রধান। ভারতের কয়েকজন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আপেক্ষিক তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনার জন্যে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনস্টাইনের সাথে দেখা করতে যান। আইনস্টাইন আসলেন এবং সকলকে বিস্ময়াভিভূত করে সংস্কৃতে প্রশ্ন করলেন- ‘কিনতে নাম? কথম আগসি? তোমাদের নাম কী? কোথা হতে এসেছো? সাক্ষাৎপ্রার্থী ভারতীয় অধ্যাপকবৃন্দের চক্ষু স্থির, হত বিহ্বলচিত্তে তারা উত্তর দিল, WE don’t know how to speak in Sanskrit. আইনস্টাইন ঝড়ের বেগে ক্ষীপ্র হয়ে বললেন- What! You say You Indians. But you can not speak in Sanskrit? উত্তরে ভারতীয়রা বললো- Sanskrit is a dead language in our country. It is used only in ancestral function. আইনস্টাইন তেলে বেগুনে জ্বলে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন এবং বললেন- Who says

Sanskrit is the dead language? It is the sole language in the world. তারপর আইনস্টাইনের বক্তব্য নিম্নরূপ- 'আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করা গীতা পড়তে পড়তে অবাক হয়ে যাই, আত্মস্থ হয়ে পড়ি এবং এই আত্মস্থ অবস্থায় পদার্থ বিজ্ঞানের অতি দুর্বোধ্য আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আমার কাছে সূর্যের আলোর মত সহজ হয়ে যায়, সকল জটিল তত্ত্ব সরল হয়ে যায়'। আইনস্টাইন আরো বললেন- 'আমি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চাইনা। সংস্কৃত অক্ষরে লেখা মূল গীতাগ্রন্থ পাঠের জন্যে আমি নিজে সংস্কৃত বর্ণমালা সংস্কৃত ব্যাকরণ আয়ত্ব করি। আমার উপলব্ধি হলো-

যতদিন বিন্ধ্যহিমাচল পর্বত থাকবে বিদ্যমান
ততদিন সংস্কৃত থাকবে দীপ্তিমান"।

[সনাতন ভাবনা ও সংস্কৃতি, মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের শ্রীমদ্ভগবত গীতা সাধনা, সংকীর্তন মাধব দাস]

বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন এমন কথা কোনোদিন বলেননি। উপরে বর্ণিত কাহিনিটি সম্পূর্ণ বানোয়াট মিথ্যা। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের নামে এমন অনেক মিথ্যা কাহিনি মডারেট হিন্দুবাদীরা ছড়িয়ে দিয়েছেন অন্তর্জালে তাদের ধর্মকে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ করার হীনস্বার্থে।

শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানই নয়, বেদে জীববিজ্ঞানও আছে। মাত্র দেড়শত বছর আগে ডারউইন ও তার সমকালীন জীববিজ্ঞানীগণ প্রাণের উৎপত্তির যে থিওরি দিলেন তা বেদের ঋষিগণ নাকি পাঁচ হাজার বছর আগেই জানতেন। কীভাবে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র মাদল দেব তার 'সনাতন আর্য্যধর্ম ও বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধে লিখেন;

"বিবর্তনবাদ অনুসারে প্রথমে জলজ জীব হিসেবে ছোট কণিকা বা জেলির ন্যায় কোষের উদ্ভব হয়। এর কিছু কিছু সাগরের নীচে মৃত বা জীবিত জমে শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদের

জন্ম দেয়, যেখান থেকে সমুদ্রের নীচের বৃক্ষরাজির উদ্ভব। ক্রমান্বয়ে ম্যানগ্রোভ জাতীয় বৃক্ষ এবং স'লজ বৃক্ষ। আবার ঐ জেলীগুলোই ক্রমান্বয়ে মৎস্যজাতীয় প্রাণীতে পরিণত হয়। ছোট মাছ থেকে বড় মাছ। মৎস্য জাতীয় জলজ প্রাণী থেকে উভচর প্রাণীর উদ্ভব যেমনঃ ব্যাঙ, কচ্ছপ। তার থেকে উদ্ভব সরীসৃপ প্রাণীর যেমনঃ সাপ, টিকটিকি ডাইনোসোর বা কিংবা পেঙ্গুইন, এমু, উটপাখি প্রভৃতি পাখির, যা পরবর্তীতে পূর্ণ পাখিতে রুপান্তরিত হয়। আবার, সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী বৃহদাকার প্রাণীর উদ্ভব হয় শূকর বাঘ, হাতি, তৃণভোজী বৃহদাকার বিলুপ্ত প্রাণী সমূহের এরই একটা অংশ এ্যাপ জাতীয় উপধারা যেখানে গরিলা, বানর শিম্পাজী প্রভৃতি অন্তর্ভক্ত। এরই ধারায় আদিম মানুষ ক্রমান্বয়ে সভ্য মানুষ। পক্ষান্তরে সনাতন ধর্মের বা আর্য্যমতের শাস্ত্র শতপথও তৈত্তিরীয় সংহিতা কিংবা বায়ু পুরাণ বা সৌরপুরাণও তাই বলে। মুলতঃ আর্যশাস্ত্র সমূহ বিবর্তনবাদের সমর্থন বা ইঙ্গিত পূর্বেই দিয়েছিল।"

এবার লেখক প্রমাণ দিচ্ছেন কীভাবে আর্যশাস্ত্রসমূহে বিবর্তনবাদের ইঙ্গিত বা থিওরি অফ ইভ্যুলেশন দেয়া আছে। বেদের ৬ জন অবতারের নাম তাদের ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

যেমন,

(১) মৎস্য

(২) কূর্ম

(৩) বরাহ

(৪) নৃসিংহ

(৫) বামন এবং

(৬) রাম।

১) জলজ প্রাণী (মৎস্য জাতীয়) মৎস্য অবতার।

২) উভচর প্রাণী (কচ্ছপ, ব্যাঙ, প্রভৃতি) কূর্ম অবতার।

৩) স্থলজ প্রাণী (শূকর, গরু, সিংহ প্রভৃতি) বরাহ অবতার।

৪) এ্যাপজাতীয় প্রাণী (শিম্পাজী বা বন্যদশার মানুষ) নৃসিংহ অবতার।
৫) মানবজাতি (বর্বরদশা) বামন অবতার।
৬) মানবজাতি (সভ্যতা) রাম অবতার।

এই হলো হিন্দুধর্ম শাস্ত্রে বর্ণিত ট্রি অফ লাইফ। আজকাল মুসলমান ধর্মের কিছু মানুষও দাবি করছেন যে কোরান বিবর্তনবাদ সমর্থন করে। অথচ মাত্র কিছুদিন আগেও হিন্দু ধর্মসহ জগতের সকল ধর্মই বিবর্তনবাদ বিরোধী ছিলেন। আধুনিক ধর্মবাদীগণ বিবর্তনের সমর্থনে ধর্মগ্রন্থের যে সকল শ্লোক বা আয়াত উল্লেখ করেন এবং শব্দ ও বাক্যের মনগড়া অর্থ বা ব্যাখ্যা দেন তা শুধু নির্মল হাসির খোরাক ছাড়া আর কিছু নয়। হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে অমানবিক, জঘন্য ঘৃণিত প্রথার নাম হলো 'বর্ণপ্রথা'। সতীদাহ প্রথা আর বর্ণপ্রথার মতো এমন অসভ্য নিয়ম-নীতি পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মে নেই। জগতের সবচেয়ে অশ্লীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মটির নাম হিন্দু ধর্ম। কোন্ লজ্জায় সেই ধর্মে বিশ্বাসীগণ তাদের ধর্মগ্রন্থকে বিজ্ঞানময় কিতাব দাবি করেন?

আবারও পাঠকগণের বোঝার সুবিধার্থে ইসলামের এক সময়ের ইতিহাস থেকে মুসলমানদের অবস্থানটা নিচে উল্লেখ করা হলো-

ইসলামে কোরানিক বিশ্বাস ও আদর্শ নীতি বিরোধী মুতাজিলা মতবাদ;
মুতাজিলা (আরবি: المعتزلة) হল ইসলামি ধর্মতত্ত্বের একটি শাখা। এটি কারণ ও যুক্তি আলোচনার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ৮ম থেকে ১০ শতাব্দীতে বসরা ও বাগদাদে এর প্রাধান্য ছিল। উমাইয়া যুগে মুতাজিলা আন্দোলনের আবির্ভাব হয় এবং আব্বাসীয় যুগে এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। ওয়াসিল ইবনে আতাকে মুতাজিলা মতবাদের জনক হিসেবে ধরা হয়। মুতাজিলারা কোরানকে আল্লাহর বাণী বলে মানতেন না। মুতাজিলা মতবাদে বিশ্বাসী আব্বাসীয় খলিফা মামুন-অর-রশীদ ক্ষমতায় থাকাকালে মোতাজিলা দর্শনকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং 'মোতাজিলাবিরোধী'দের খুঁজে বের করে শাস্তি প্রদানের জন্য 'মিহনা' (আরবের ইসলামি রাষ্ট্র কর্তৃক মুরতাদের শাস্তি বা

ব্লাসফেমি আইন) অফিস ব্যবহার করেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ছিলেন মিহনার প্রথম শিকার। 'আরব জাতির ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা ফিলিপ কে. হিট্টি 'মিহনা' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন-

"ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, মুক্তচিন্তার সমর্থনে যে আন্দোলন (মোতাজিলা মতবাদ) গড়ে উঠেছিল সেটাই পরে চিন্তার স্বাধীনতা দমনের এক মারাত্মক হাতিয়ার হয়ে উঠল।" [দ্রষ্টব্য: আরব জাতির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৪১৯]

খলিফা মামুনের পরবর্তী দুই উত্তরসূরির (মামুনের ছোট ভাই খলিফা আল-মুতাসিম এবং ভাইয়ের ছেলে আল-ওয়াসিফ) আমলেও রক্ষণশীল আদর্শের অনুগামীদের ওপর নির্যাতন চলতে থাকে। তারপর খলিফা মামুনের ভাইপো (মুতাসিমের ছোট ছেলে) আল-মুতাওয়াক্কিলের শাসনকালে এসে ৮৪৮ থেকে ৮৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মোতাজিলা দর্শন থেকে রাষ্ট্রীয় সমর্থন সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে পূরণো রক্ষণশীল মতবাদকেই স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। শুরু হয় আবার মোতাজিলা অনুসারীদের প্রতি নির্যাতন-নিপীড়ন। দার্শনিক আল কিন্দি, মনসুর আল-হাল্লাজ, শালমাযানী, কবি রুদাকী, সুফি শিহাবুদ্দিন ইয়াহিয়া, সালাহুদ্দিন এবং তাঁর সন্তান আল-মালিক আল-জাহির, পার্সিয়ান কবি আব্দুল ফুতুহ, ইরানের শ্রেষ্ঠতম সুফিবাদী কবি জালালউদ্দিন রুমি প্রমুখ এই নিপীড়নের শিকার হোন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধর্মবাদী-শাষকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ-ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্মদ্রোহিতা-আল্লাহদ্রোহিতার অভিযোগ তুলে মুসলিম বিশ্ব থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের সূর্য অস্তমিত করে দেন। এরপর সুদীর্ঘকাল মুসলিম বিশ্বে মুক্তচিন্তার অধিকারী কোনো মানুষ গড়ে ওঠতে পারেন নি। এ জন্য অনেকাংশেই দায়ী আল-গাজ্জালি, আল-আশারির মতো ইসলাম ধর্ম নিয়ে একগুঁয়েমি আর গোঁয়ার্তুমি মনোভাবের ব্যক্তিগণ।

ঠিক এমনি বৈদিক ধর্মের বিপরীতে এক সময়ে জন্ম নেয়া চার্বাক দর্শন ভারতীয় দর্শনের প্রধান শাখাগুলোর অন্যতম ছিল। এটি আধ্যাত্মবাদবিরোধী নিরীশ্বরবাদী ও বস্তুবাদী দর্শন। এই দর্শন কোনো প্রকার প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী নয়, 'প্রমাণ'ই এ-দর্শন অনুসারে যথার্থ জ্ঞানের উৎস। পারলৌকিক নয়, ইহজাগতিক সুখ ভোগই মানুষের একমাত্র কাম্য বলে চার্বাকরা মনে করতেন। এই মতবাদ অনুসারে অচেতন জড়পদার্থই একমাত্র সত্তা এবং মন, প্রাণ, চৈতন্য প্রভৃতি জগতের সব বস্তুই জড় পদার্থ হতে তৈরি। এই মতের অনুসারীরা আত্মা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। চার্বাক দর্শন বলতে জড়বাদী নাস্তিক দর্শনকেই বুঝায়।

চার্বাকগণ বলেন- তারাই বেদের কর্তা যারা ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর। বেদ প্রতারক পুরোহিতদের সৃষ্টি। সুতরাং চার্বাকগণের মতে বেদকে বিশ্বাস করা মানুষের উচিত নয়।

চার্বাক দর্শনগুরু বৃহস্পতিবচন-

'ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্তনিশাচরাঃ।
জর্ফরীতুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্।।' (সর্বদর্শনসংগ্রহ)

অর্থাৎ, যারা তিন বেদ রচনা করেছেন তাঁরা নেহাতই ভণ্ড, ধূর্ত ও চোর (নিশাচর)। জর্ফরীতুর্ফরী (প্রভৃতি অর্থহীন বেদমন্ত্র) ধূর্ত পণ্ডিতদের বাক্যমাত্র।

চার্বাকগণ কেন বলেন যে, বেদের কর্তারা ভণ্ড, ধুর্ত নিশাচর, প্রতারক, বেদকে বিশ্বাস করা মানুষের উচিত নয়, এর পেছনে তারা প্রচুর যুক্তি প্রমাণ দেখিয়েছেন। বেদের কর্তাদের সমস্ত চিন্তাধারা মূলত জাগতিক সুখ ও সমৃদ্ধি অর্থাৎ পার্থিব কামনাভিত্তিক।

অন্যান্য সকল ধর্মের ধর্মগ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যও এটিই। আর প্রত্যেক ধর্মেরই এই উদ্দেশ্য হাসিলের পন্থা বা তরিকা প্রায় অভিন্ন। মানুষকে ধোকা দিয়ে মানুষের সাথে প্রতারণা করে পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারই ধর্মগ্রন্থ রচনা ও ধর্মাচারের নামে লোক দেখানো ভণ্ডামি।

সকল ধর্মগ্রন্থের দোয়া বা প্রার্থনাবাণীগুলো নির্মোহভাবে পরীক্ষা পর্যালোচনা করলেই তাদের অসৎ উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার বুঝা যায়। বেদ রচয়ীতাদের ধূর্তামিটা চার্বাকগণ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। আত্মা আর পরজনমে চার্বাকদের বিশ্বাস ছিলনা। তারা মনে করেন দেহই আত্মা, দেহের মৃত্যুর সাথে আত্মা ধ্বংস হয়ে যায়। 'আত্মা' আর 'পরজনম' শব্দ দুটো মানুষকে ধোকা দেয়ার হাতিয়ার। মৃত্যুর পরেও মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্যে দোয়া প্রার্থনা আর পরজনমে পুরষ্কারের লোভে দান খয়রাত বা যজ্ঞের আয়োজন মোল্লা পুরোহিতদের পেটপূর্তির বিরাট প্রতারণা।

বেদবাদীদের প্রার্থনা বা বেদমন্ত্রগুলিকে চার্বাক বৃহস্পতি বলেছেন 'ধূর্ত্ত-প্রলাপস্ত্রয়ী' (বার্হস্পত্যসূত্র-৫৯) এগুলি প্রলাপ। তিনি বলেন, এগুলির প্রণেতারা পণ্ডিত নয় ভণ্ড। চার্বাক মতে, এই সব পুরোহিতেরা অলস বুদ্ধিহীন নির্বোধ ও পৌরুষবিহীন, তারা জীবিকার জন্যে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন।

'অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ।।' (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-২/১৪)।।

অর্থাৎ, অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিদণ্ডধারণ, ভস্মানুলেপন প্রভৃতি বুদ্ধিহীন ও পৌরুষহীনদের জীবিকার্জনের উপায়।

চার্বাদকদের মতে-

'অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা।।' (সর্বদর্শনসংগ্রহ)

অর্থাৎ, যাদের না-আছে বুদ্ধি, না খেটে খাবার মুরোদ তাদের জীবিকা হিসাবেই বিধাতা যেন সৃষ্টি করেছেন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, তিন বেদ, সন্ন্যাসীদের ত্রিদণ্ড, গায়ে ভস্মলেপন প্রভৃতি ব্যবস্থা।

মুসলমানদের ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান সামাজিক বিধান যেমন শিন্নি, দান-খয়রাত, মানত, কোরবানী ইত্যাদির মতো 'যজ্ঞ' প্রাচীন ভারতের আর্য জাতির একটি প্রধান সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিশেষ। অবশ্যই এই যজ্ঞ, বলিদান, শিন্নি, দান-খয়রাত, মান্নত যে, লাউ কুমড়ো, হাঁস মুরগী, স্বর্ণালংকার, শাক শব্জি, ফল মূল, গরু বাছুর, ভেড়া ছাগল, টাকা পয়সা হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। আর্য শাস্ত্রমতে- দেবতার উদ্দেশ্যে কোনো জিনিস বা দ্রব্য দানকে বলা হয় যজ্ঞ। এই দান করা হতো দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য। অনেক সময় নিজের, দেশের কল্যাণ্যের জন্যও দান করা হতো। যজ্ঞের উদ্দেশ্যের বিচারে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।

স্মার্তকর্ম:

বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, বিবাহ, উপনয়ণ ইত্যাদির লৌকিক বা জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য এই যজ্ঞের আয়োজন করা হতো। এই যজ্ঞের বিধানশাস্ত্রের নাম ছিল গৃহ্যসূত্র।

অনেক পাঠকের আগ্রহ থাকতে পারে জানার যে, উপনয়ন কী?

উপনয়ন একটি হিন্দু শাস্ত্রানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দু বালকেরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে দীক্ষিত হয়। হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে, উপনয়ন হিন্দু বালকদের শিক্ষারম্ভকালীন একটি অনুষ্ঠান। হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের জন্য উপনয়নের ন্যূনতম বয়স যথাক্রমে সাত, তেরো ও সতেরো বছর। উপনয়নকালে বালকদের ব্রহ্মোপদেশ শিক্ষা দেওয়া হয়। মনুস্মৃতি অনুযায়ী, এরপর তারা ব্রহ্মচারী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। বাঙালি হিন্দু সমাজে অবশ্য কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেই উপনয়ন সংস্কার প্রচলিত। উপনয়ন অনুষ্ঠানে শরীরে যজ্ঞোপবীত বা উপবীত (চলিত বাংলায় পৈতে) ধারণ করা হয়। উপবীত প্রকৃতপক্ষে তিনটি পবিত্র সুতো যা দেবী সরস্বতী, গায়ত্রী ও সাবিত্রীর প্রতীক। উপবীত ধারণের সময় উপবীতধারী গায়ত্রী মন্ত্র শিক্ষা করে। উপনয়নের পর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দ্বিজ বলা হয়। দ্বিজ শব্দের অর্থ দুইবার জাত। হিন্দু বিশ্বাস

অনুযায়ী, প্রথমবার ব্যক্তির জন্ম হয় মাতৃগর্ভ থেকে; এবং দ্বিতীয়বার জন্ম হয় উপবীত ধারণ করে।

শ্রৌতকর্ম:

পারলৌকিক কল্যাণ, আত্মপ্রচার, বৃহৎ কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য এই যজ্ঞের আয়োজন করা হতো। অগ্নিহোত্র, অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞ এই তালিকায় ছিল। এই যজ্ঞের নাম ছিল শ্রৌতসূত্র।

উল্লেখ্য আরণ্যকযুগে পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞের প্রচলন হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে জ্যোতিষ্টোম, গোষ্টম, আয়ুষ্টোম যজ্ঞেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

যজ্ঞে দ্রব্য ত্যাগ করার প্রক্রিয়াকে আহূতি বলা হয় আর যজ্ঞে যে দ্রব্য ত্যাগ করা হয় তাকে বলা হয় হব্য। হব্যের তালিকায় থাকতো ঘৃত, পায়েস, দুধ, রুটি, পশুমাংস, সোমলতার রস ইত্যাদি। যে ব্যক্তির হিতার্থে যজ্ঞ করা হয় তাঁকে বলা হয় যজমান। আর যিনি যজমানের জন্য যজ্ঞের কাজ সম্পাদন করেন তাঁকে বলা হয় যাজক বা ঋত্বিক।

যজ্ঞের বর্ণানুক্রমিক তালিকা-

অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, আয়ুষ্টোম, ইষ্টিযজ্ঞ, গোষ্টম, জ্যোতিষ্টোম, দেবযজ্ঞ, পুত্রেষ্টি, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ এবং রাজসূয়যজ্ঞ।

বেদের বিধানমতে, পুত্রকামী ব্যক্তি তাঁর কামনা পূরণের জন্য ‘পুত্রেষ্টি’ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত হবেন, পশুকামীর কামনা পূর্তি হবে ‘চিত্রা’ যজ্ঞের মাধ্যমে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যজ্ঞগুলির অনুষ্ঠানের পরেও পুত্রলাভ বা পশুলাভ অনেক সময় হয় না। চার্বাকদের মতে এই ধরনের ব্যাপার বৈদিক মন্ত্রের অসত্যতা প্রমাণ করে।

যাজকদের ব্যাপারে তারা বলেন; পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর যদি যজ্ঞকারীর পুত্রলাভ হয় তখন ধূর্ত যাজকেরা তাঁদের নির্দেশিত যজ্ঞকেই পুত্রলাভের কারণ হিসেবে প্রচার করেন। আর পুত্র জন্মগ্রহণ না করলে যাজকেরা যজ্ঞের অশুদ্ধতা বা ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন এবং একে সমস্ত ব্যাপারের জন্য দায়ী করেন। তাঁরা মন্তব্য করেন যে যজ্ঞানুষ্ঠান যথাবিহিত নিয়মানুসারী না হওয়ার ফলে যজমান যজ্ঞের মাধ্যমে অভিলষিত ফললাভে বঞ্চিত হয়েছেন। ঠিক একইরকম ব্যাপার মুসলমানদের মাঝেও লক্ষ্য করা যায়।

বেদমতে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে পশুকে বলি দেওয়া হয় সেই পশুর স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। এর প্রেক্ষিতে চার্বাক মত হলো-

‘পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে।।’ (সর্বদর্শনসংগ্রহ)

অর্থাৎ, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে নিহত পশু যদি সরাসরি স্বর্গেই যায়, তাহলে যজমান কেন নিজের পিতাকে হত্যা করে না? (অর্থাৎ, নিজের পিতাকে স্বর্গে পাঠানোর এরচেয়ে সহজ পথ আর কী হতে পারে?)

চার্বাকগণ মনে করেন, দেহনাশের পরই জীবের যাবতীয় অস্তিত্বের অবসান হয়ে যায়। নির্বাপিত দীপ যেমন জ্বালানীর সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও আলোকদানে অক্ষম মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধের মাধ্যমে উৎসর্গীকৃত কোনোকিছু মৃত ব্যক্তির কোনো উপকার করতেও অক্ষম।

‘গচ্ছতামিহ জন্তূ’নাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্।
গেহস্থকৃতশ্রাদ্ধেন পথি তৃপ্তিরবারিতা।।’
‘স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে।।’ (সর্বদর্শনসংগ্রহ)

অর্থাৎ, যে পৃথিবী ছেড়ে গেছে তার পাথেয় কল্পনা করা বৃথা, কেননা তাহলে ঘর ছেড়ে কেউ গ্রামান্তর গমণ করলে ঘরে বসে তার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিলেই তো তার পাথেয়-ব্যবস্থা সম্পন্ন হতো। যিনি স্বর্গে গেছেন তাঁর উদ্দেশে দান নেহাতই বৃথা। কেননা তাহলে যিনি প্রাসাদের উপরে উঠে গেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে (মাটিতে বসে) দান করলেও তো তাঁর তৃপ্তি হবার কথা।

‘অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নং তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্তিতম্।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরং চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্তিতম্।
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচর-সমীরিতম্।।’ (সর্বদর্শনসংগ্রহ)

অর্থাৎ, (বৃহস্পতি বলেন) সেই ভণ্ডরাই বিধান দিয়েছেন, অশ্বমেধ-যজ্ঞে যজমান-পত্নী অশ্বের শিশ্ন গ্রহণ করবে। তেমনি প্রতারকেরাই (নিশাচর) মাংস খাবার মতলবে (যজ্ঞে পশুবলির) বিধান দিয়েছেন।

হিন্দু ধর্মবাদীগণ তাদের ধর্মগ্রন্থ বেদকে যে যুক্তিহীন প্রমাণহীনভাবে অলৌকিক গ্রন্থ বা ঈশ্বরের বাণী বলে দাবি করেন চার্বাকেরা যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে তা মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন।

হিন্দুধর্মে সমকামিতা, ব্যভিচার ও পরকীয়ার শাস্তির নজির তুলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করবোনা। সংক্ষেপে এ নিয়ে ড. অভিজিৎ রায়ের একটি লেখার কিছু অংশ এখানে তুলে দেয়া হলো। অভিজিৎ লিখেন;

“রামায়নের একটা ঘটনা বলি। সগরবংশীয় অংশুমানের পুত্র মহারাজা দিলীপ নিঃসন্তান হয়ে মৃত্যুবরণ করলে জন্ম রক্ষায় সমস্যা দেখা দেয়। শিব সেসময় আবির্ভূত হয়ে রাজার দু-জন বিধবা স্ত্রীকে আদেশ করেন সন্তানলাভের জন্য পরস্পর দেহমিলন করতে। তাদের মিলনে সন্তান জন্মায় বটে, কিন্তু সে সন্তান ছিল অস্থিহীন। পরে ঋষি অষ্টাবক্রের বরে সেই সন্তান সুস্থ এবং উত্তমাঙ্গ হন এবং ভগীরথ নামে রাজ্যশাসন করেন। এটিকে

(দু'জন বিধবা স্ত্রীর মিলনে ভগীরথের জন্ম) নারী সমকামিতাকে গ্রহণযোগ্য করার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন হিন্দু উদারপন্থীরা। আরো কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া যাবে হিন্দু পুরাণ থেকে। কথিত আছে লঙ্কা পরিভ্রমণের সময় হনুমান রাবনের স্ত্রীগণের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থা চাক্ষুষ দেখেছিলেন। সমকামিতার উল্লেখ ছাড়াও বৈদিক সাহিত্যে আমরা পাই লিঙ্গ-পরিবর্তনের কাহিনি। বিষ্ণুর মোহিনী অবতাররূপে ধরাধামে এসে শিবকে আকর্ষিত করার কাহিনি এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ ছাড়াও যে দুটো চরিত্র সবার আগে আলোচনায় আসবে তা হচ্ছে- মহাভারতের শিখণ্ডী ও বৃহন্নলার কাহিনি। এমনকী, নর-নারীর 'শারীরিক' মিলন ছাড়াও সন্তান জন্ম নেওয়ার উপকথার সন্ধান মিলে রামায়ণ এবং মহাভারতের মতো বৈদিক সাহিত্যগুলোতে। যেমন, সীতার জন্ম মাটি থেকে আর দ্রৌপদীর জন্ম যজ্ঞের অগ্নি থেকে। জরাসন্ধের জন্ম হয় দু'জন পৃথক নারীর গর্ভে জন্ম নেয়া অর্ধ অঙ্গবিশিষ্ট পৃথক সন্তানের সংমিশ্রণে ইত্যাদি। এগুলোকে উদারপন্থীরা ব্যবহার করেন এই বলে যে, হিন্দুধর্ম সমকামিতা, উভকামিতা, উভলিঙ্গত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উদার। কিন্তু যেটা তারা বলেন না, তা হল এর উল্টো চিত্রটি। মনুসংহিতার আইনে উল্লেখ আছে-

'যদি কোন বয়স্কা নারী অপেক্ষাকৃত কম বয়সী নারীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে বয়স্কা নারীর মস্তক মুণ্ডন করে দুটি আঙ্গুল কেটে গাধার পিঠে চড়িয়ে ঘোরানো হবে' *(Manu Smriti chapter 8, verse 370.)*।

যদি দুই কুমারীর মধ্যে সমকামিতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহলে তাদের শাস্তি ছিল দুইশত মুদ্রা জরিমানা এবং দশটি বেত্রাঘাত *(Manu Smriti chapter 8, verse 369.)*।

সেতুলনায় পুরুষদের মধ্যে সম্পর্কের শাস্তি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বলা হয়েছে- দু'জন পুরুষ অপ্রকৃতিক কার্যে প্রবৃত্ত হলে তাদেরকে জাতিচ্যুত করা হবে *(Manu*

Smriti Chapter 11, Verse 68.) এবং জামা পরে তাকে জলে ডুব দিতে হবে *(Manu Smriti Chapter 11, Verse 175.)*। ইত্যাদি।

'শুশ্রুত' নামক প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে স্ত্রী-সমকামিতার কথা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, দুই নারী যদি যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হয় তাহলে অস্থিহীন সন্তানের জন্ম হবে। মহাভারতে ভগীরথের জন্মকাহিনিতে এই ধরনের সংস্কারের সমর্থন মেলে। হিন্দুধর্ম যে আসলে সমকামিতার ব্যাপারে কতো 'উদার', তা বোঝা যায় ১৯৯৭ সালে দীপা মেহেতার 'ফায়ার' ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর হিন্দু ধর্মবাদীদের তাণ্ডব দেখলে।"
[ড. অভিজিৎ রায়, সমকামিতা; অষ্টম অধ্যায়, শুদ্ধস্বর প্রকাশনী, ঢাকা]

আধুনিক, মডারেট বা উদারপন্থী যে বিশেষণেই ডাকা হোক না কেন, তারা যে ধর্মগ্রন্থ মানেন, যা বিশ্বাস করেন, যে ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন করেন, একজন অশিক্ষিত, সেকেলে, মূর্খ মানুষও তা সেভাবেই করেন। অন্ধবিশ্বাসে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এখানে শিক্ষিত বিবেকানন্দ আর অশিক্ষিত, মানসিক বিকারগ্রস্ত, প্রায়-অর্ধোন্মাদ গদাধরের (রামকৃষ্ণের) মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

গদাধরের কথা উঠলোই যখন, এই সুযোগে তার কিছু বাণী ও ধারণা পাঠকদের সামনে পেশ করে নিই। নারীদের নিয়ে রামকৃষ্ণ যা বলেছেন তা বর্তমানকালের কোনো নিরেট মূর্খরাও মুখে উচ্চারণ করবে না।

আসলে নারীদের নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা আর যৌন-ভীতি ছিল। তিনি সকল স্ত্রীলোককে নাকি 'মা হিসেবে' দেখতেন! এমনকি তার নিজের স্ত্রী সারদা দেবীকেও। বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীকে একটা সময় পরে তিনি 'ভাই বোনের' মতো থাকার পরামর্শ দিতেন। সম্ভবত রামকৃষ্ণ তার শরীরের হরমোনজনিত কোনো দূর্বলতার কারণে নারীর যৌনক্ষুধা নিবারণে অক্ষম ছিলেন বলেই নারীর প্রতি তার প্রবল ঘৃণা বিদ্বেষ ছিল বলে অনেকে মনে করেন। রামকৃষ্ণ বলেন;

১) নারী ‘নরকের দ্বার।

২) মেয়ে মানুষের কাছে খুব সাবধান হ’তে হয়। মেয়েদের ত্রিভূবন দিলে সব খেয়ে ফেলবে।

৩) আমি মেয়ে বড় ভয় করি। দেখি যেন বাঘিনী খেতে আসছে। আর তাদের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, ছিদ্র সব খুব বড় বড় দেখি! সব রাক্ষসীর মতো দেখি।

৪) মেয়ে মানুষের শরীরে কী আছে – রক্ত, মাংস, চর্বি, নাড়ীভুঁড়ি, কৃমি, মূত্র, বিষ্ঠা এই সব। সেই শরীরের উপর ভালবাসা কেন?

৫) দেখ না, মেয়ে মানুষের কি মোহিনী শক্তি, অবিদ্যারূপিনী মেয়েদের! পুরুষগুলোকে যেন বোকা অপদার্থ করে রেখে দেয়। যখনই দেখি স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গে বসে আছে, তখন বলি, আহা! এরা গেছে।

৬) হাজার ভক্ত হলেও মেয়েমানুষকে বেশিক্ষণ কাছে বসতে দিই না। একটু পরে হয় বলি - ‘ঠাকুর দেখো গে যাও’; তাতেও যদি না উঠে, তামাক খাবার নাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি।

৭) যদি স্ত্রীলোক ভক্তিতে গড়াগড়ি যায়, তবুও তার কাছে যাতায়াত করবে না।

৮) মেয়ে মানুষের সঙ্গে থাকলেই তাদের বশ হয়ে যেতে হয়।

৯) মেয়ে ভক্তদের গোপাল ভাব- ‘বাৎসল্য ভাব’ বেশি ভাল নয়। ঐ ‘বাৎসল্য’ থেকেই আবার একদিন ‘তাচ্ছল্য’ হয়।

১০) মেয়ে মানুষের গায়ের হাওয়া লাগাবে না; মোটা কাপড় গায়ে দিয়ে থাকবে, পাছে তাঁদের হাওয়া গায় লাগে।

এই যদি হয় গুরুর অবস্থা, তাহলে শিষ্য বিবেকানন্দের বিবেক কেমন হবে তা আর বলার প্রয়োজন আছে কি? বিবেকানন্দ একজন ব্যক্তি স্বার্থপর, নারী বিদ্বেষী, জাত বিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িক, বর্ণবাদী, চরম হিন্দুমৌলবাদী মানুষ ছিলেন।

“বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন, সে জন সেবিছে ঈশ্বর।“

এ ছিল চতুর শিক্ষিত বিবেকানন্দের চূড়ান্ত ভণ্ডামি। একটি উদাহরণই যথেষ্ট তার ভণ্ডামিটা বুঝার জন্যে। কল্পিত ভগবানকে পাওয়ার জন্য পাঁঠাবলি দেয়ার ব্যাপারে বিবেকানন্দ বললেন 'একটা পাঁঠা কী, যদি মানুষ বলি দিলে ভগবান পাওয়া যায়, তাই করতে আমি রাজি আছি'।

তিনি প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণকে 'বেশ্যাবৃত্তির' সাথে তুলনা করে তিরস্কার করেছেন। হিন্দু সমাজত্যাগী মুসলিমদের স্বামীজি 'দেশের শত্রু' বলেও চিহ্নিত করেন।

বিবেকানন্দ বলেন;
'কোনো লোক হিন্দু সমাজ ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে সমাজে শুধু যে একটি লোক কম পড়ে তা নয়। একটি করে শত্রু বৃদ্ধি হয়'।

তিনি হিন্দু সমাজককে মুসলিমদের সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন;

'এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, মুসলমানগণ যখন ভারতে প্রথম আসে, তখন ভারতে এখনকার অপেক্ষা কতো বেশি হিন্দুর বসবাস ছিল, আজ তাহাদের সংখ্যা কতো হ্রাস পাইয়াছে'।

শুধু ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের উপর ঝাল ঝেড়েই স্বামীজি ক্ষান্ত হননি, হিন্দুধর্মের যাবতীয় কুসংস্কারের দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন বৌদ্ধধর্মের উপরে। তিনি বলেন;

'আমাদের সমাজে যে সকল বিশেষ দোষ রহিয়াছে, সেইগুলি বৌদ্ধধর্মজাত। বৌদ্ধধর্মই আমাদিগকে তাহার উত্তরাধিকারস্বরূপ এই অবনতির ভাগী করিয়াছে'।

ভারত যে হিন্দু-প্রধান দেশ, এবং দেশটা মূলতঃ সেজন্য হিন্দুদের জন্যই সেটা সব সময় বিবেকানন্দ মাথায় রাখতে চেয়েছেন। হিন্দুধর্মের এই জল হাওয়া কারো অপছন্দ হলে তাকে 'মানে মানে সরে পড়বার' উপদেশ দিয়ে বিবেকানন্দ বলেন;

'এ দেশে সেই বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালি পাঁঠা খাবেন আর কৃষ্ণ বাঁশি বাজাবেন এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন'?

সমাজ সংস্কারক নাকি প্রথার অচলায়তনে বন্দী বিবেকানন্দ? বিবেকানন্দকে সমাজ সংস্কারকের তকমা লাগিয়ে মিডিয়ায় তুলে ধরা হলেও তিনি আসলে যে বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন, আর সেই সাথে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, পুরুষের বহুবিবাহসহ অনেক কুৎসিত প্রথাকে সমর্থন করেছিলেন, তার বেশকিছু দৃষ্টান্ত আমরা উপরে দেখেছি। তিনি প্রথাবিরোধী কেউ ছিলেন না, বরং প্রথার সুচতুর রক্ষক। এটার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রথার অচলায়তনে বন্দী বিবেকানন্দের নিজস্ব স্বীকারোক্তি থেকেই; 'যতোই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, ততই এই প্রাচীন প্রথাগুলি আমার ভালো বলিয়া মনে হইতেছে'। তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি এতোই মোহাবিষ্ট ছিলেন যে, সংস্কারের প্রয়োজনে পাছে ধর্মে আঘাত লাগে, তাই 'সমাজ সংস্কার ধর্মের কাজ নয়' বলে নিশ্চেষ্ট থাকতে চেয়েছেন। তার ব্রাহ্মণ শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছেন, 'তুই বামুন, অপর জাতের অন্ন নাই খেলি'।

জাতিভেদ প্রথার সমর্থনে এর চেয়েও স্পষ্ট উক্তি আছে স্বামীজির। তাঁর মতে, জাতিভেদ আছে বলেই ত্রিশ কোটি মানুষ এখনো খাবার জন্য এক টুকরো রুটি পাচ্ছে'। (দ্রষ্টব্যঃ অভিজিৎ রায়, স্ব বিরোধী বিবেকানন্দ)

আগেই উল্লেখ করেছিলাম অন্ধবিশ্বাসে শিক্ষিত অশিক্ষিতের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। ভারতের অশিক্ষিত সাধক গদাধর আর বাংলাদেশের অশিক্ষিত মোল্লা শফির মাঝে নারীকে নিয়ে এক জায়গায় বড় মিল আছে। রামকৃষ্ণ বলেন;

'স্ত্রীলোক কীরূপ জান? যেমন, আচার তেঁতুল। মনে করলে মুখে জল সরে। আচার তেঁতুল সম্মুখে আনতে হয় না'।

এই প্রবন্ধ লেখাকালীন সময়েই কিছু হিন্দু ধর্মাবাদীদের মন্তব্য নজরে আসলো; তারা বলতে চান যে, হিন্দুধর্ম যুগের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী সকল আধুনিক নতুন আইন-বিধান মতবাদ গ্রহণে সক্ষম। তবে ক্ষীণস্বরে চুপি চুপি তারা এও স্মরণ করিয়ে দেন, 'তবে তা হতে হবে বেদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থাৎ বেদ সমর্থিত'।

আধুনিক মুসলমানরাও একইভাবে বলেন, নতুন সবকিছু মানি 'তবে তা হবে পুরাতন কোরান সমর্থিত'। মডারেট হিন্দুদের দাবি এই ধর্মে মৌলবাদ বা মৌলবাদীত্ব বলতে কিছু নেই। সুতরাং জঙ্গীবাদ, মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতা এখন আর হিন্দুধর্মে নেই। এমন কি তাদের কেউ কেউ এও বলেন যে, আজকাল হিন্দুরা বেদে বিশ্বাস করেন না, মনুস্মৃতির আইন কানুন অচল হয়ে গেছে তারা এসব মানেন না।

কেউ কেউ আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেন যে, তারা নাকি শাস্ত্র মানেন নিজের বিবেক দিয়ে, আর এই বিবেক তাদেরকে শিখিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। কী শিক্ষাটা তারা স্বামীজীর কাছ থেকে নিয়েছেন তা তো স্বামীজীর অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। তবু কিছু সাম্প্রতিক ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

প্রথমে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখের একটি পত্রিকার রিপোর্টে দেখা যায়:
'আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ভারতে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বুধবার অ্যামনেস্টির বার্ষিক রিপোর্টে এ অসহিষ্ণুতা কমাতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতাকে বড় করে তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'নাগরিক সমাজের যেসব সংগঠন সরকারি নীতির সমালোচনা করছে, কর্তৃপক্ষ তাদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করছে। বিদেশি অনুদানের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। দেশে ধর্মীয় উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লিঙ্গ ও জাতি

ভিত্তিক বৈষম্য ও সহিংসতা ব্যাপকভাবে রয়েছে।' রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, 'সেন্সরশিপ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর মৌলবাদী হিন্দু গোষ্ঠীগুলোর আক্রমণের ঘটনা বেড়েছে। বহুক্ষেত্রে ধর্মীয় সহিংসতার ঘটনা বন্ধ করতে না পারা এবং কখনো কখনো উত্তেজক ভাষণের মাধ্যমে মেরুকরণ এবং সামগ্রিক জাতিভিত্তিক বৈষম্য ও হিংসার মাধ্যমে উত্তেজনায় ইন্ধন দেয়ার জন্যে ভারত সরকারের সমালোচনা করা হয়েছে। রিপোর্টে শিল্পী, লেখক এবং বিজ্ঞানীরা যেভাবে অসহিষ্ণুতা বাড়ার বিরুদ্ধে জাতীয় সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন তার উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতাকে তুলে ধরা হয়েছে'।

বর্তমান সময়ে ভারতে বাকস্বাধীনতার ওপর হিন্দু মৌলবাদীদের অনবরত আক্রমণের প্রেক্ষিতে দুঃখ প্রকাশ করে লেখক প্রেমেন্দ্র মজুমদার লিখেন; 'আজকের দিনে জন্মালে হয়তো রাজা রামমোহন রায় বা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পক্ষেও সম্ভত হতোনা, সতীদাহ প্রথা রোধ বা বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন করার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে। বরং ধর্মীয় ভাবাবেগ আহত করার অপরাধে তাঁদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ারই প্রবল আশংকা ছিল'।

বুঝা গেল বর্তমান ধর্মানুভূতির অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ! অভিজিৎ রায় তাঁর লেখায় 'ফায়ার' ছবি নিয়ে হিন্দু মৌলবাদীদের তাণ্ডবের কথা উল্লেখ করেছিলেন। শুধু দীপা মেহেতার 'ফায়ার' ছবিই হিন্দুধর্মবাদীদের ধর্মানুভুতি আহত করেনি, আরো অনেক ছবিই তাদের রোষাণলে পড়েছে। সঞ্জয়লীলা বানসালির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ছবি 'পদ্মাবতী'র শুটিংয়ে বাধা দিয়ে কার্নি সেনা নামে রাজপুত গ্রুপের একদল কর্মী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছাড়াও ক্ষিপ্ত হয়ে জয়গড় কেল্লায় ছবির সেটে ভাংচুর করে, সেইসঙ্গে পরিচালক বানসালিকে চপেটাঘাত ও লাঞ্ছিত করেছিল। বানসালির অপরাধ, তার ছবিতে নায়ক মুসলমান আলাউদ্দিন খিলজির সাথে নায়িকা রাণী পদ্মাবতীর প্রেমদৃশ্য।

একটি কাল্পনিক চরিত্রও হিন্দু ধার্মিকদের অনুভূতিতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে! আলোচিত তারকা সানি লিওন অভিনীত বলিউড মুভি 'রাগিনি এমএমএস টু' নিষিদ্ধ ও লিওনকে ভারত ছাড়ার হুমকিও দিয়েছিল ভারতের একটি হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন। হিন্দু জনজাগৃতি সমিতি (এইচজেএস) সিনেমাটিকে ভারতীয় সংস্কৃতি, মর্যাদা ও হিন্দু দেব-দেবীদের বিরুদ্ধে অবমাননাকর বলে দাবি করে। এছাড়া দেবতা শ্রী হনুমান চরিত্রের ব্যবহারেও হিন্দু ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা হয়েছে বলে তারা দাবি জানায়। তাহলে আমরা কি ধরে নেবো যে, হিন্দুদের ধর্মানুভূতি ভোতা হয়নি মোটেই, বরং আগের চেয়েও তার ধার বেড়েছে অনেকগুণ বেশি। এছাড়াও আমাদের সামনে রয়েছে হিন্দু কর্তৃক বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনা, আছে গুজরাটের লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস। এ নিয়ে আমরা আলোচনা করবো এই লেখার শেষ পর্যায়ে।

জাগতিক বিভিন্ন কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে কিন্তু ভগবানকে খুশি করতে নিজের জীবন নিজে বিসর্জন করেছে এমন ঘটনা খুবই বিরল। কিন্তু মাত্র কিছুদিন আগে ভারতে এমন ঘটনাও ঘটেছে। একজন হিন্দু ধার্মিক দেবীর সামনে গলা কেটে নিজেকে বলি দিয়েছেন আর একজন নারী ভগবানকে তুষ্টির লক্ষ্যে উপবাস করে আত্মহত্যা করেছেন। পত্রিকার খবরে প্রকাশ, এখনও ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পালিত হয় সতীদাহ প্রথা। ধর্মের নামে, পূণ্যের নামে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় সদ্য বিধবাদের। মহারাষ্ট্রের লাতুরে এক মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু উস্কে দিল সেই আশঙ্কা। মৃতার নাম ঊষা দেবী। ৫০ বছর বয়সী গৃহবধূ ছিলেন লাতুরের লোহাটা গ্রামের বাসিন্দা। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ঊষাদেবীর স্বামী তুকারাম মান। সেদিনই দাহ করা হয় ৫৫ বছর বয়সী এই ব্যক্তিকে আর রাত থেকেই নিখোঁজ ছিলেন ঊষাদেবী। পরের দিন মৃতের অস্থি সংগ্রহ করতে গিয়ে গ্রামবাসী এবং পরিজনরা দেখেন, তুকারামের চিতার উপর পড়ে আছে ঊষার অর্ধদগ্ধ দেহ। সেখানেই ওঠে প্রশ্ন, তাহলে কি সহমরণে গেছেন ঊষাদেবী, নাকি তাঁকে সতী হতে বাধ্য করা হয়েছে?

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর সতীত্বের পরীক্ষা দিয়েছিলেন রাজস্থানের ১৮ বছরের তরুণী রূপ কানোয়ার। তবে অনেকেই বলেন, তরুণী রূপকে জোর করে স্বামীর চিতায় তুলে দেওয়া হয়েছিল। বিহারের সহর্ষ জেলার পারমানিয়া গ্রামেও গাহওয়া দেবী নামের এক মহিলা স্বামীর চিতাতেই পুড়ে মারা গেছেন। সহর্ষর জেলা সদর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে পারমানিয়ার বাসিন্দারা কিন্তু ওই সহমরণের ঘটনায় রীতিমতো গর্বিত বোধ করেছেন। কেউ কেউ রাজস্থানে রূপ কানোয়ারের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এক গ্রামবাসী যেমন বলেছিলেন, 'বছরকয়েক আগে রাজস্থানে যে-ঘটনার কথা শুনেছিলাম,আজ আমাদের গ্রামেও সেই একই জিনিস ঘটলো। এ থেকে বোঝা যায় ওই দম্পতির মধ্যে কী গভীর প্রেম ছিল'!

এ সব উন্মাদনার প্রেরণাটা আসে কোত্থেকে? এছাড়া হিন্দুধর্মের বর্ণপ্রথা, বর্ণবিদ্বেষও যে হিন্দু সমাজে আজও রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় আছে কি?

মুসলমানরাই শুধু বেশি সন্তান জন্ম দিয়ে নবির উম্মত বাড়াবার চিন্তা করে না, হিন্দুরাও হিন্দুধর্মের প্রসার ঘটানো ও শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশি সন্তান জন্ম দেয়ার চেষ্টায় আছেন। ভারতের কাশী সুমেরপীঠের শঙ্করাচার্য নরেন্দ্রানন্দ সরস্বতী হিন্দুদের কমপক্ষে ১০ সন্তানের জন্ম দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। উত্তর প্রদেশের গোণ্ডাতে এক ধর্মীয় সভায় তিনি ওই আহ্বান জানান। শঙ্করাচার্য বলেছেন, 'যেখানে যেখানে হিন্দুদের সংখ্যা কমে গেছে সেখানে সন্ত্রাসবাদ বেড়েছে। এজন্য যারা পরিবার পরিকল্পনার কথা বলে তারা নির্বোধ। আজকের দিনে পরিবার নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবাই উচিত নয়। বরং বেশি বেশি করে সন্তান জন্ম দেয়ার সামর্থ রাখতে হবে'।

তাঁর দাবি, হিন্দুদের অকপটে সন্তান জন্ম দিতে হবে যাতে হিন্দুধর্মের প্রসার ঘটানো যায়। তিনি বলেন, 'যদি দশরথ পরিবার নিয়ন্ত্রণ করতেন তাহলে ভরতের মতো ভাই কী করে পাওয়া যেত'?

এর আগে বিজেপি সংসদ সদস্য সাক্ষী মহারাজ হিন্দুধর্ম রক্ষা করার নামে হিন্দু মহিলাদের ৪ সন্তান জন্ম দেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেত্রী সাধ্বী প্রাচীও ৪ সন্তানের পক্ষে সাফাই দেন। যদিও পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের বিজেপি নেতা সমীর গোস্বামী দাবি করেন ৪ টি নয়, ৫ সন্তানের জন্ম দিতে হবে। অবশ্য এদের সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন শঙ্করাচার্য নরেন্দ্রানন্দ সরস্বতী। ভারতের নাগপুরে হিন্দু পণ্ডিতদের একটি সভার শ্লোগান ছিল 'ধর্ম বাঁচাতে ১০টি করে সন্তান নিন'।
পণ্ডিতগণ পরামর্শ দেন 'হিন্দু ধর্মকে বাঁচানোর জন্য প্রচুর মানুষ লাগবে। এজন্য হিন্দুদের প্রচুর সন্তান জন্ম দিতে হবে। কে খাওয়াবে সেটা নিয়ে চিন্তা করা বন্ধ করো। ভগবান তোমার সন্তানদের দেখভাল করবে'।

২০১১ সালের আদমশুমারীর তথ্যানুযায়ী ভারতে হিন্দু সংখ্যা ৮০% মুসলমান ১৪% আর ৬% বাকি অন্যান্যরা। এমনিতেই ৮০ পার্সেন্ট তারপরেও হিন্দু প্রোডাকশন বাড়ানোর এমন প্রয়োজন কেন পড়লো? উত্তরটা একেবারেই সোজা।

শক্তি, Power জনবল,বাহুবল। এককথায় লাঠির সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সংখ্যালঘু অন্যান্য ধর্মের মানুষের উপাসনালয় মসজিদ, গির্জা ভাঙ্গতে লাঠির প্রয়োজন হয়। ভারতে ৮০% মুসলমান হলে অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার সাহস হিন্দুরা যেমন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতেন না, তেমনি বাংলাদেশ ৯০% হিন্দুদের দেশ হলে মুসলমানরাও জিহাদী জোশে বৌদ্ধ বিহার, হিন্দু মন্দির ধ্বংস করতে পারতেন না। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলেই ভারতে আওয়াজ উঠে, 'হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করো নতুবা ভারত ছাড়ো'। ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ সালের 'ঢাকা টাইমস' এর একটি খবরের শিরোনাম ছিল- 'বাংলাদেশীদের হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে হবে, না হলে ভারত ছাড়তে হবে'। প্রস্তাবটি করেছিলেন ভারতের কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বজরাং দলের মীরাটের আহবায়ক বলরাজ দুঙ্গার। ২০১৫ সালে গৌহাটির এক অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতা সুব্রামানিয়ান স্বামী তাচ্ছিল্যভরে উচ্চারণ করেন 'Mosque is not a religious place but is just a building that can be demolished any time. (হিন্দুস্থান টাইমস, মার্চ ২০১৫)

এই হুংকারের পাশাপাশি আরেক হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) ঘোষণা দিয়েছিল, পরের মাসে তারা চার হাজার মুসলিমকে হিন্দুধর্মে 'ফিরিয়ে আনবেন'। এই 'ফিরিয়ে আনবেন' শব্দটির মানে কী? এর মানে মুসলমানরা কোনোদিনই মুসলমান ছিলনা তারা মূলত হিন্দু ছিলেন। কাবা শরিফ যে এক সময় হিন্দুদের ছিল এবং হজরে আসওয়াদ পাথর যে শিবলিঙ্গের অনুরূপ, হিন্দুদের পক্ষ থেকে সে কথাও আজকাল উঠেছে। এখানেই ক্ষমতা বা শক্তির মোজেজা। এটাই সংখ্যালঘু দূর্বলের ওপর সংখ্যাগুরু সবলের অত্যাচারের খড়গ। কল্পনা করা যায় ৯০ পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ বাংলাদেশে প্রকাশ্য মাঠে হিন্দু মেয়ের সাথে কথা বলার জন্যে কিছু হিন্দু যুবক একটি মুসলমান যুবককে বিদ্যুত বাতির খুঁটিতে বেঁধে উলঙ্গ করে মারপিট করতে পারে? এমন ঘটনাও ঘটেছে ভারতের কর্নাটকের ম্যাঙ্গালোরে। (টাইমস অব ইন্ডিয়া ২৭/০৮/২০১৫)

প্রায় দেড় দশক আগে ভারতের গুজরাটে মুসলিম আবাসিক এলাকা গুলবার্গ হাউজিংয়ে হামলা চালিয়ে ৬৯ জনকে হত্যার ঘটনাটিকে আহমেদাবাদের বিশেষ আদালত বলেছে 'সভ্য সমাজের ইতিহাসে অন্ধকারতম দিন'। গুজরাটে আহমেদাবাদ শহরের গুলবার্গ সোসাইটি আবাসিক কমপ্লেক্সে ২০০২ সালে মুসলমান বিরোধী দাঙ্গার সময় ৬৯ জন মুসলিমকে কুপিয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। ওই আবাসিক কমেপ্লেক্সের বাসিন্দা একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক, কংগ্রেস সংসদ সদস্য এহসান জাফরিকেও কুপিয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। মিসেস জাফরি বলেন তাঁর স্বামী মিঃ মোদীর কাছে সাহায্য চেয়ে ফোন করেছিলেন, কিন্তু সে সাহায্য কখনই পৌঁছায়নি। নরেন্দ্র মোদী ওই ঘটনার সময় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং সহিংসতা বন্ধে কোনো পদক্ষেপ নেন নি এমনকি দাঙ্গার জন্য কখনই দুঃখপ্রকাশ করেন নি। 'বিবিসি বাংলা' জানায়-

'২০০২ সালে তিনদিন ধরে গুজরাটে চলেছিল মুসলমান বিরোধী দাঙ্গা। বহু মুসলমানের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হয়। একটি ট্রেনে আগুনে ৬০ জন হিন্দু তীর্থযাত্রীর প্রাণহানিকে কেন্দ্র করে দাঙ্গার সূচনা হয়। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনার জন্য

মুসলমানদের দায়ী করে হিন্দু দাঙ্গাকারীরা মুসলমানদের বাড়িঘরে হামলা চালায় তিনদিন ধরে। গুজরাটের শহরে ও গ্রামে মুসলিমদের লক্ষ করে যে ব্যাপক হামলা চালানো হয় তার মধ্যে বড়ধরনের হামলা হয়েছিল গুলবার্গ আবাসিক কমপ্লেক্সে। গুজরাটের ওই দাঙ্গায় প্রায় এক হাজার মানুষ নিহত হয়েছিলো'।

বাদীপক্ষের আইনজীবীদের দাবি, নারী ও শিশুসহ যাদের লক্ষ্য করে সেদিন হামলা চালানো হয়েছিল, তাদের সবাই 'নিরপরাধ মানুষ' ছিলেন। ধরে নিলাম ট্রেনে আগুন দিয়েছিল মুসলমানরাই। এখন প্রশ্ন হলো, ট্রেনে আগুন দিয়ে অন্যায় করলো করিম, এ জন্যে রহিমের স্ত্রীর ঘর জ্বালানো হয় কেন? রহিমের স্ত্রী পুত্র কন্যাদের অপরাধটা কী? নিরপরাধ মুসলমানের বাড়ি ঘর পোড়ানো, এদের মালপত্র লুটপাট হয় কেন? কোত্থেকে আসে এই বিদ্বেষ, এই ঘৃণার চাষাবাদ হয় কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরটাই সাক্ষী দেয় যে, এখনও কিছু হিন্দু আছেন যারা বেদ ও মনুস্মৃতি মেনে চলেন, এখনও কিছু হিন্দু পরিবারে সাম্প্রদায়িকতার ছবক শেখানো হয়।

ফরাসী গণিতবিদ-দার্শনিক Pascal যথার্থই বলেছিলেন "Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction" আর একদিন ভারতবর্ষে বাংলার রেনেসাঁসের অন্যতম প্রাণপুরুষ বলে পরিচিত হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) ও তাঁর অনুসারীরা সোচ্চারে ঘোষণা দিয়েছিলেন, "If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism"।

সহায়ক তথ্যাবলী ও গ্রন্থপঞ্জি:

(১) সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা) ২০০২, মনুসংহিতা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

(২) শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৯৭, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা।

(৩) কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৮, ধর্ম ও নারী, এলাইড পাবলিশার্স, কলকাতা।

(৪) কঙ্কর সিংহ, ২০০৫, মনুসংহিতা ও নারী, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

(৫) সুকুমারী ভট্টাচার্য, ২০০২, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

(৬) অভিজিৎ রায়, স্ববিরোধী বিবেকানন্দ, মুক্তমনা বাংলা ব্লগ।

(৭) প্রবীর ঘোষ, ১৯৯৪, যুক্তিবাদের চোখে নারী-মুক্তি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

(৮) রণদীপম বসু, চার্বাকের খোঁজে, শুদ্ধস্বর প্রকাশনী, ঢাকা।

(৯) অভিজিৎ রায়, সমকামিতা: একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান, শুদ্ধস্বর প্রকাশনী, ঢাকা।

(১০) অনন্ত বিজয় দাশ, 'সনাতন ধর্মে'র দৃষ্টিতে নারী'।

যখন সন্ত্রাসী মুসলমান মানুষ হত্যা করে তখনই সেখানে আর একদল হিন্দু ঘোষণা দেন **'আমাদের ধর্মে জিহাদ নেই,** সাম্প্রদায়ীকতা নেই, সন্ত্রাস নেই; আমাদের ধর্ম মানবিক এমন কি বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণীত সত্য ধর্ম। অকারণে ঠাকুর ঘর থেকে বারবার যদি চিৎকার শুনা যায় **'আমি কলা খাইনা**' তাহলে উঁকি মেরে একবার তো দেখতেই হয় ঠাকুর ঘরের অবস্থাটা কেমন।

আমরা এই বইয়ে ইতিহাস ও তথ্য প্রমাণের আলোকে হিন্দু ধর্মের স্বরুপ উন্মোচন করবো যেনো নতুন প্রজন্ম আসল সত্যটা জানতে পারে। হিন্দু পরিবারের একটি সন্তানও যদি বইটি পড়ে ধর্মের অসাড়তা বুঝতে পারে, তাহলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি এই সন্তানটি ধর্মের কারণে কোনোদিন কোনো মানুষকে ঘৃণা করবেনা কোনো নিরপরাধ মানুষ খুন করবেনা।

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.com